সাপ্তাহিক

সংকলন

রেজি: ডিএ ৬০৫৮ সংখ্যা-২৪ । বুধবার । ১৬ আশ্বিন ১৪২১
০৫ জিলহজ্ব ১৪৩৫ । ০১ অক্টোবর ১৪২১ । ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি শুরু?

ঐক্যের পথে সকল ধর্ম

মানবতার কল্যাণে
সত্যের প্রকাশ
দৈনিক দেশেরপত্র

সম্পাদকীয়

ধর্ম কি? এবাদত কি?

ধর্ম হল কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি, গুণ বা স্বভাব, যা তাকে তার বৈশিষ্ট্যে অটল রাখে। আগুনের ধর্ম হলো পোড়ানো। মানুষের ধর্ম হলো মানবতা। এটা যদি হারিয়ে যায় তবে ঐ আগুন বা মানুষ ধর্মহীন হয়ে যায়। আজকে দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, গেরুয়া বসন, তিলক-চন্দন ইত্যাদি থাকলে, হাদিস-কোর'আন বা শাস্ত্রবাক্য মুখস্থ থাকলে মনে করা হয় সে ব্যক্তি ধার্মিক। কিন্তু না, এটা ধার্মিকতার সংজ্ঞা নয়। ধার্মিক হল সেই ব্যক্তি যিনি মানবতাকে লালন করেন, মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন। পৃথিবীতে প্রকৃত ধার্মিকের আজ বড়ই অভাব, লেবাসসর্বস্ব বক ধার্মিকের অভাব নেই, ধর্মব্যবসায়ীর অভাব নেই, কিন্তু ধর্ম তথা মানবতার জন্য জীবন উৎসর্গকারীর বড়ই অভাব। প্রত্যেকে যদি তার নিজ নিজ ধর্মকে সুচারুরূপে পালন করতেন তাহলে আজকের পৃথিবী এত অশান্তিময় হতো না। চারিদিকে এত দুঃখ, কষ্ট, ক্রন্দন আর হাহাকার থাকত না। আমরা চাই প্রত্যেকে প্রকৃত ধর্মজ্ঞান লাভ করে, স্রষ্টা কেন ধর্ম দিয়েছেন সেটা উপলব্ধি করে সে ধর্ম পালন করুক। আল কোর'আনে স্রষ্টা বলছেন, আমি মানুষকে এবাদত ছাড়া আর কোন কিছু করার জন্য সৃষ্টি করি নি। (সুরা যারিয়াত ৫৬)। এবাদত করার আগে জানতে হবে কি সেই এবাদত। শুধু মসজিদ-মন্দির-গীর্জা-প্যাগোডায় মশগুল হয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকলেই কি এবাদত করা হয়? না। এবাদত হোচ্ছে মানুষের কল্যাণে কাজ করা। মানুষের শান্তির জন্য কাজ করা। মানুষ যেন শান্তিতে দরজা খুলে ঘুমাতে পারে, মানুষ যেন দু'মুঠো খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে এই নিশ্চয়তা বিধান করাই এবাদত। আজ মনে করা হয় স্রষ্টা বুঝি মক্কায় আছেন, গয়া-কাশিতে আছেন, রোম-বেথেলহেমে আছেন। কিন্তু না, স্রষ্টা শুধু ওখানে নেই। স্রষ্টা নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের মাঝে আছেন। সমাজের নিপীড়ন-নির্যাতন দূর করার জন্য যিনি চেষ্টা করবেন তিনিই স্রষ্টার সান্নিধ্য পাবেন। তার মানে এই নয় যে, নামাজ-রোজা-উপাসনা-প্রার্থনার দরকার নেই, বস্তুত যিনি মানবতার কল্যাণে কাজ করবেন, শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবেন তার চরিত্রকে বিশুদ্ধ ও উপযুক্ত রাখার জন্যই এবাদত-উপাসনা, নামাজ-রোজা, পূজা-প্রার্থনা। অন্য কারও জন্য ঐসব ধর্মকর্ম নিষ্ফল। মানবজীবন তখনই সার্থক হবে যখন মানুষ নিজেকে অন্যের কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

পৃথিবী আজ পশ্চিমা বস্তুবাদী 'সভ্যতা'– দাজ্জালের গোলাম, দাজ্জালের মিডিয়ার অবিশ্রান্ত প্রচারণায়, শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে মানুষ আজ আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থের পূজারী। এটাই মানবতার চূড়ান্ত পরাজয়, মানবজন্মের ব্যর্থতা। দাজ্জালের Divide and Rule নীতির কারণে মানবজাতি শত-সহস্রভাগে বিভক্ত। দলে দলে, ধর্মে ধর্মে, দেশে দেশে, সমাজে সমাজে, মানুষে মানুষে এই বিভাজন যতদিন থাকবে ততদিন মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। তাই আমরা যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর অনুসারীরা মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। আমরা পুরো মানবজাতিকে একটা কথার উপর ঐক্যবদ্ধ করতে চাই- আমরা একই স্রষ্টার সৃষ্টি, একই বাবা-মা আদম-হাওয়ার সন্তান। একই স্রষ্টা প্রদত্ত ধর্মগ্রন্থের অনুসারী। কাজেই আমরা সবাই ভাই বোন। আমাদের মাঝে কোনো বিভেদ নেই।

এ কাজে আমাদের কোনো ১. অর্থনৈতিক স্বার্থ নেই। ২. আমাদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া আমাদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বরং এটা করতে গিয়ে আমরা আমাদের সমস্ত সম্পদ অকাতরে দান করছি। আমরা আমাদের এই জাতিটাকে বিশ্বের দরবারে একটা সমৃদ্ধশালী-শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এই উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন, জাতীয় জাদুঘর, পাবলিক লাইব্রেরি, জাতীয় প্রেসক্লাব, শিল্পকলা একাডেমি, জেলা-উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনসহ সারা দেশব্যাপী জেলা-উপজেলা-ইউনিয়ন এমনকি গ্রাম পর্যায়ে আমাদের অসংখ্য সেমিনার, আলোচনা সভা, গোলটেবিল বৈঠক ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। পত্রিকা, বই-পুস্তক, প্রামাণ্যচিত্র, সংকলন, হ্যান্ডবিল বিতরণ ইত্যাদি সকল উপায়ে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। যতদিন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অন্যায়-অবিচার, অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তপাত নির্মূল হয়ে মানবজাতি এক জাতি না হবে ততদিন আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এনশা'ল্লাহ। আমাদের এই সঙ্কলন এই অব্যাহত প্রচেষ্টারই অংশবিশেষ।

সূচিপত্র

- প্রচলিত এসলাম এসলাম নয় কেন-২
- সত্যনিষ্ঠ আলেমদের প্রতি-৪
- মোশরেকদের হজ্বে যাওয়া নিষেধ-৭
- উম্মতে মোহাম্মদীর গৌরবময় অতীত ও বীভৎস বর্তমান-৯
- হিরোশিমা-নাগাসাকির ধ্বংসলীলা-১২
- দাজ্জাল শারীরিক দানব নয়-১৪
- 'সকল ধর্মের মর্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপিত, আলোচিত, গৃহীত সিদ্ধান্ত-১৬
- বর্ষায় উত্তপ্ত রাজনীতি, সামনে শীতকাল কোন দিকে যাচ্ছে দেশ?-১৮
- বিশ্বময় উত্তপ্ত পরিস্থিতি শুরু হয়ে গেছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ!-২০
- অন্য আলোয় দেখা: আল্লাহর পছন্দনীয় ধর্ম কোনটি?-২২
- এক নজরে হেযবুত তওহীদ-২৬
- মাননীয় এমামুযযামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়-২৯

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ)
প্রকাশক : অ্যাডভোকেট আমিনুল হক আকবর। সম্পাদক কর্তৃক মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ২২৩, মধ্য বাসাবো (সবুজবাগ থানা সংলগ্ন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪।
ফোন: ০২-৭২১৮১১১, ০১৭৭৮২৭৬৭৯৪, বিজ্ঞাপন বিভাগ: ০১৮১৯২৭৮৭৮২, ইমেইল: desherpatro14@gmail.com

প্রচলিত এসলাম এসলাম নয় কেন

বর্তমানে মোসলেমসহ সমগ্র মানবজাতি এসলামের ভিত্তি তওহীদ থেকে বিচ্যুত হোয়ে শুধু উপাসনার মধ্যেই এসলামকে সীমাবদ্ধ কোরে ফেলেছে। সমগ্র জীবনে স্রষ্টার দেওয়া হুকুম বিধান পরিত্যাগ কোরে দাজ্জালের তৈরি জীবনব্যবস্থা (System) মেনে নিয়ে আজ তারা শেরকে নিমজ্জিত। ফলে তাদের সকল এবাদতই অর্থহীন হোচ্ছে, কেননা তওহীদহীন কোন এবাদতই আল্লাহ গ্রহণ করেন না।

মূল : এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

আদম (আঃ) থেকে মোহাম্মদ (দঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর সময় এই দীনের মূলমন্ত্র রাখা হোয়েছে-একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন এলাহ নেই (লা এলাহা এল্লাল্লাহ)- এবং পরে যোগ হোয়েছে তদানীন্তন নবীর নাম। এই কলেমার মূলমন্ত্রে কখনো এই এলাহ শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ স্রষ্টা ব্যবহার করেন নি। এটা এই জন্য যে তিনি 'একমাত্র' হুকুমদাতা, একমাত্র সার্বভৌমত্বের মালিক যার আদেশ-নিষেধ ছাড়া আর কারো আদেশ নিষেধ গ্রাহ্য নয়, যার বিধান এবং নির্দেশ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি ব্যাপারে অলংঘনীয়। কলেমার এই ঘোষণামতে কেউ যদি তাঁর কতগুলি আদেশ-নির্দেশ মেনে নিলো কিন্তু অন্য কতকগুলি অস্বীকার করলো, তবে তিনি আর তার 'একমাত্র' এলাহ রোইলেন না। সংক্ষেপে এই দীনের ভিত্তি তওহীদের মর্মার্থ হোচ্ছে আমি জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যেখানেই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য আছে সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি যে বিভাগেই হোক না কেন, সেই ব্যাপারে আমি আর কারও কোন বক্তব্য, নির্দেশ মানি না। যে বিষয়ে আল্লাহ অথবা তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য নেই সে বিষয়ে আমরা স্বাধীনভাবে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। এর ঠিক বিপরীত হোচ্ছে শেরক। সেটা হোচ্ছে, জীবনের যেখানে, যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য বা বিধান আছে, সেখানে তাদের সেই বিধানকে অমান্য কোরে অন্য কারও তৈরি বিধান মানা। আজ এই শেরক-এ পুরো মানবজাতি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হোয়ে আছে। অথচ যে বা যারা আল্লাহর তওহীদে থাকবে না, যারা তাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের যে কোন একটি ভাগে, অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা নিজেদের তৈরি আইন-কানুন, রীতি-নীতি গ্রহণ বা প্রয়োগ কোরবে তাকে বা তাদেরকে আল্লাহ মাফ না করার অঙ্গীকার কোরেছেন (সুরা নেসা ৪৮)। তাদের কোন আমলই আল্লাহ গ্রহণ কোরবেন না।

আল্লাহর এই সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও অনেকে বোলতে পারেন আমরা কিভাবে কাফের মোশরেক হোলাম, আমরা তো নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, হজ্ব কোরি। তাদের এই মনোভাবের জবাবে বোলতে চাই মক্কার কাফের মোশরেকেরা রসুল (দঃ) কে এই কথাই বলতো। রসুলাল্লাহর সমসাময়িক সময়ের যাদেরকে আমরা কাফের মোশরেক বোলে জানি, অর্থাৎ আবু জেহেল, আবু লাহাব, ওতবা, শায়েবা, তাদের ধর্মীয় অবস্থা বর্তমান মোসলেম দাবিদারদের থেকে মোটেই আলাদা নয়। আমাদের মাঝে একটা ভুল ধারণা আছে যে তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতো না, আল্লাহকে আল্লাহ বোলে মানতো না ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহর কোর'আন এবং ইতিহাস কিন্তু বলছে অন্য কথা। ঐ আরবরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বোলে, পালনকারী বোলে বিশ্বাস কোরত, নামাজ পড়তো, কাবা শরীফকে আল্লাহর ঘর বোলে বিশ্বাস কোরত, ঐ কাবাকে কেন্দ্র করে বাৎসরিক হজ্ব কোরত, কোরবানি কোরত, রোজা রাখতো, আল্লাহর নামে কসম কোরত, আমাদের মতোই এব্রাহীমকে (আঃ)-তারা জাতির পিতা বোলে বিশ্বাস কোরত, এব্রাহীম (আঃ)-কে তাদের নবী হিসাবে

আল্লাহর রসুল আখেরী যামানা সম্পর্কে বোলেছেন, এমন সময় আসবে যখন- (১) এসলাম শুধু নাম থাকবে, (২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, (৩) মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াত থাকবে না, (৪) আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব, (৫) তাদের তৈরী ফেতনা তাদের ওপর পতিত হবে। [আলী (রাঃ) থেকে বায়হাকী, মেশকাত]

মানতো। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় দলিল, বিয়ে-শাদির কাবিন ইত্যাদি সমস্ত কিছু লেখার আগে আল্লাহর নাম লিখতো। তারা লিখতো- বেস্‌মেকা আল্লাহুম্মা, অর্থাৎ তোমার নাম নিয়ে (আরম্ভ কোরছি) হে আল্লাহ, অর্থাৎ আমাদের মতোই। আরবের মোশরেকেরা আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিলো এ কথায় সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ। কোর'আনে তিনি তাঁর রসুলকে বোলছেন- তুমি যদি তাদের (আরবের মোশরেক, কাফের অধিবাসীদের) জিজ্ঞাসা করো, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি কোরেছেন? তবে তারা অবশ্যই জবাব দেবে- সেই সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী (আল্লাহ) (সুরা যুখরুফ- ৯)। এমন আয়াত আরও আছে। ইতিহাস ও আল্লাহর সাক্ষ্য, দু'টো থেকেই দেখা যায় যে, যে মোশরেকদের মধ্যে আল্লাহর রসুল প্রেরিত হোলেন তারা আল্লাহকে গভীরভাবে বিশ্বাস কোরত। তারা হাবল, লা'ত, মানাতের পূজা কোরত ঠিকই কিন্তু ওগুলোকে তারা আল্লাহ বোলে বিশ্বাস কোরত না, ওগুলোকে স্রষ্টা বোলেও মানতো না। তারা বিশ্বাস কোরত যে হাবল, লা'ত, মানাত, ওজ্জা এরা দেব-দেবী, যারা ওগুলোকে মানবে, পূজা কোরবে তাদের জন্য ঐ দেব-দেবীরা সেই আল্লাহর কাছেই সুপারিশ কোরবে (সুরা ইউনুস- ১৮, সুরা যুমার ৩)। ঠিক যেমন আজকে পীরদের ব্যাপারে মানুষ ধারণা কোরে থাকে।

আজকে মোসলেম নামক এই জাতি যে অবস্থায় আছে তাদের চাইতে কোন অংশে কম নয়। এরাও আল্লাহ বিশ্বাস করে, নিজেদেরকে মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মাহ বোলে বিশ্বাস করে, হজ্ব করে, কোরবানি করে, খতনা করে। মক্কার ঐ লোকগুলো ব্যক্তি জীবনে এত কিছু করার পরও তাদেরকে আল্লাহ কাফের মোশরেক বোললেন কেন? কারণ তারা আল্লাহর তওহীদ মানতো না, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানতো না, তাদের জাতীয়, সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত কোরত নিজেদের সমাজপতিদের তৈরি করা আইন-বিধান দ্বারা। এজন্য আল্লাহর রসুল এসে প্রথমেই তাদেরকে অন্য কোন কিছু না বোলে কেবলমাত্র তওহীদ মেনে নেওয়ার আহ্বান জানালেন এবং প্রচণ্ড বাধা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্নভাবে কালেমার বালাগ চালিয়ে গেলেন। নবুয়্যতের প্রথম ১৩ বছর তিনি অন্য কোন কিছুর দিকে আহ্বান করেন নি। তিনি বলেন নি যে, তোমাদের হজ্ব হয় না, হজ্ব ঠিক করে নাও, নামাজ হয় না নামাজ ঠিক করে নাও, কোরবানি হয় না ইত্যাদি ঠিক করে নাও। এমন কি সমাজে তাঁর চোখের সামনে যে অবিচার হতো তিনি সেগুলোরও কোন প্রতিবাদ করেন নি। শুধুমাত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে তওহীদের ডাক দিয়ে গেছেন, কারণ তিনি জানতেন তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা এক স্রষ্টার বিধান প্রতিষ্ঠা হোলে সমাজ থেকে সর্বরকম অন্যায়, অবিচার অর্থাৎ অশান্তি দূর হোয়ে যাবে।

বর্তমান দুনিয়াতে যে এসলামটি চালু আছে তাতে এই তওহীদ নেই, সর্বত্র আল্লাহকে কেবল উপাস্য বা মা'বুদ হিসাবে মানা হোচ্ছে, কিন্তু এলাহ বা সার্বভৌমত্বের আসনে আল্লাহ নেই। তওহীদহীন এসলাম মানেই প্রাণহীন, আত্মাহীন জড়বস্তু। মানুষ নিজেই এখন নিজের জীবনব্যবস্থা তৈরি কোরে সেই মোতাবেক জীবন চালাচ্ছে, মানুষ নিজেই এলাহ অর্থাৎ বিধাতার আসনে আসীন। মানুষের তৈরি জীবন-ব্যবস্থাগুলিকেই (দীন) মানবজীবনের সকল সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান হিসাবে মনে করা হোচ্ছে যদিও সেগুলির সবই মানুষকে শান্তি দিতে চরমভাবে ব্যর্থ। মানুষের এলাহর আসন থেকে আল্লাহকে সরিয়ে (Dethroning) দিয়ে সেখানে পাশ্চাত্য 'সভ্যতা'- দাজ্জালকে অর্থাৎ মানুষকে বোসিয়ে (Replacement) যে ধর্ম পালন করা হোচ্ছে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আমাদের বৃহত্তর ও সমষ্টিগত জীবনে গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার ও গ্রহণ কোরে নিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনের সার্বভৌমত্বটুকু আমরা আল্লাহর জন্য রেখেছি। সেই জাল্লে-জালাল, আযিযুল জব্বার, স্রষ্টা ভিক্ষুক নন যে তিনি এই ক্ষুদ্র তওহীদ গ্রহণ কোরবেন। তাছাড়া ওটা তওহীদই নয়, ওটা শেরক ও কুফর।

আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোনটি স্বীকার, গ্রহণ কোরে নিলে সে আর মোসলেম বা মো'মেন থাকতে পারে না। কোনো লোক যদি ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী এবং জাতীয় জীবনের আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারও যেমন- সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার, সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির, রাজা-বাদশাহর বা একনায়কের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী হয় তবে সে মোশরেক। আর উভয় জীবনেই কোন লোক যদি আল্লাহ ছাড়া ঐগুলির যে কোনটায় বিশ্বাস করে তবে সে কাফের। তাই যেহেতু এই মোসলেম দাবিদার জনসংখ্যাটি তাদের জাতীয় জীবনে কেউ গণতন্ত্র, কেউ সমাজতন্ত্র, কেউ রাজতন্ত্র, কেউ একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্র-মন্ত্র, ism, cracy মেনে চোলছে অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাদ দিয়ে ঐ সমস্ত তন্ত্রমন্ত্রের সার্বভৌমত্ব মানছে, সেহেতু তারাও কার্যতঃ (Defacto) মোশরেক ও কাফেরে পরিণত হোয়েছে।

[সম্পাদনায়ঃ মোহাম্মদ রিয়াদুল হাসান, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক দেশেরপত্র, ই-মেইলঃ mdriazulhsn@gmail.com]

সত্যনিষ্ঠ আলেমদের প্রতি

প্রকৃত আলেম তারাই যাদের জ্ঞান মানবতার কল্যাণে ব্যয়িত হয়।

মসীহ্ উর রহমান

আলেম শব্দটির অর্থ জ্ঞানী। প্রকৃত আলেম হোচ্ছেন মহান আল্লাহ। তাঁর একটি নামই হোচ্ছে 'আলেম'। আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর দীন সম্পর্কে যারা জ্ঞান অর্জন কোরবেন তারাও এক প্রকার আলেম বা জ্ঞানী। যদিও বর্তমানে কেবল দীন সম্পর্কে যারা জ্ঞানী তাদেরকেই আলেম বলা হয়, এই ধারণা এক প্রকার অন্ধত্ব। আল্লাহ 'এল্‌ম' বোলতে কি বুঝিয়েছেন? হাদিসে কুদসীতে এর জবাব পাওয়া যায়। মুসা (আ:) একবার আল্লাহকে সাতটি প্রশ্ন কোরেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো- আল্লাহ! আপনার বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানী কে? আল্লাহ বোললেন- যে জ্ঞানার্জনে কখনো তৃপ্ত হয় না এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞানকেও যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞানের মধ্যে জমা কোরতে থাকে (আবু হোরায়রা (রা:) থেকে বায়হাকী ও ইবনে আসাকির; 'হাদিসে কুদসী' ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে আল্লাহ জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ কোরেছেন। প্রথমটি তাঁর দেয়া হেদায়াহ ও সত্যদীনের জ্ঞান যা তিনি সৃষ্টির প্রথম থেকে তাঁর নবী-রসুলদের মাধ্যমে তাঁর কেতাবসমূহে মানবজাতিকে অর্পণ কোরে আসছেন, যার শেষ কেতাব বা বই হোচ্ছে আল-কোর'আন। এটা হোচ্ছে অর্পিত জ্ঞান। আর মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে পড়াশোনা, চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোরে যে জ্ঞান অর্জন করে তা হোলো অর্জিত জ্ঞান। মুসার (আ:) প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ নির্দিষ্ট কোরে 'মানুষের অর্জিত জ্ঞান' বোললেন, শব্দ ব্যবহার কোরলেন 'আন্-নাসু', মানুষ। অর্থাৎ যে আল্লাহর অর্পিত জ্ঞান, অর্থাৎ দীন সম্বন্ধে জ্ঞান, এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞান– এই উভয় প্রকার জ্ঞান অর্জন কোরতে থাকে এবং কখনোই তৃপ্ত হয় না অর্থাৎ মনে করে না যে তার জ্ঞানার্জন সম্পূর্ণ হোয়েছে, আর প্রয়োজন নেই, সেই হোচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানী, আলেম। পক্ষান্তরে আমাদের সমাজে অনেকেই আছেন যারা নিজেদের আলেম, অর্থাৎ জ্ঞানী মনে করেন, আল্লাহর দেয়া জ্ঞানীর সংজ্ঞায় তারা আলেম নন, কারণ শুধু দীনের জ্ঞানের বাইরে মানুষের অর্জিত জ্ঞানের সম্বন্ধে তাদের সামান্যতম জ্ঞানও নেই এবং সেই জ্ঞান সম্বন্ধে পিপাসাও নেই।

আজ থেকে ১৪শ' বছর আগে উম্মতে মোহাম্মদী জাতিটির সৃষ্টি হয়। তারা এক আল্লাহ, এক রসুল, এক কোর'আনের অনুসারী হিসাবে অর্ধপৃথিবী জুড়ে একটি ইস্পাতের মত ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড জাতিসত্ত্বা হিসাবে বিরাজমান ছিলেন। সেই জাতি আজ সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোয়ে ১৬০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তাদের সেই ঐক্য সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে। সেই জাতিটি এখন রাজনৈতিকভাবে পঞ্চান্নটির মত ভৌগোলিক রাষ্ট্রে, দীনের ব্যাখ্যায় বহু মাযহাবে ও ফেরকায়, আধ্যাত্মিকভাবে শত শত তরিকায় এবং ইহুদি খ্রিস্টানদের নকল কোরে হাজার হাজার রাজনৈতিক দলে-উপদলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। তারা পৃথিবীতে ১৬০ কোটি হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলির অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র এবং দুঃখের বিষয় হোচ্ছে সে অবজ্ঞা ও ঘৃণা বুঝার শক্তিও এ জাতির নেই। অন্যান্য জাতিগুলোর এসকল অন্যায়ের প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধতা করার শক্তিও তাদের নেই, কখনও কোরলে পরাজয় ও অপমান অবধারিত। আল্লাহ কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে এবং সুরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে মো'মেনদের এই পৃথিবীর আধিপত্য ও কর্তৃত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যতদিন ঐ জাতি, জাতি হিসাবে মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে গেছে ততদিন আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা কোরেছেন- অর্ধেক পৃথিবীতে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল এবং ঐ জাতি যদি তখন সত্য প্রতিষ্ঠার জেহাদ ত্যাগ না কোরত তবে অবশ্যই আল্লাহ বাকি অর্ধেকও তাদের হাতে তুলে দিতেন এবং রসুলাল্লাহ ও তাঁর জাতির উপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্বও পূর্ণ হতো। আল্লাহর ঐ প্রতিশ্রুতির মধ্য থেকে আরেকটি সত্য ফুটে ওঠে- সেটা হোলো এই যে, আমরা নিজেদের মো'মেন অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাসী বোলে দাবি কোরি। তাহোলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর কর্তৃত্ব, আধিপত্য আমাদের হাতে নেই কেন? তাহোলে সেই সর্বশক্তিমান কি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা কোরতে অসমর্থ (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেক)? এর একমাত্র জবাব হোচ্ছে- আমরা যতোই নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, যতোই হাজার রকম এবাদত কোরি, যতোই মোত্তাকী হই, আমরা মো'মেন নই, মোসলেম নই, উম্মতে মোহাম্মদী হবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

আল্লাহ কোর'আনে মো'মেনের সংজ্ঞা দিচ্ছেন- "প্রকৃত মো'মেন শুধু তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করে, তারপর (ঈমান আনার পর) আর তাতে কোন সন্দেহ করে না, এবং তাদের জীবন ও সম্পত্তি দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করে" (সুরা হুজরাত ১৫)। আল্লাহর দেয়া মো'মেনের সংজ্ঞায় দু'টি শর্ত দেয়া হোলো; প্রথম শর্ত হোচ্ছে আল্লাহ ও রসুলের ওপর ঈমান, অর্থাৎ তওহীদ, যার অর্থ হোচ্ছে জীবনের সর্বাঙ্গনে সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি যাই হোক না কেন, যে বিষয়ে আল্লাহ বা তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য আছে, কোন আদেশ-নিষেধ আছে সে বিষয়ে আর কাউকে না মানা। দ্বিতীয় শর্ত হোলো ঐ তওহীদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করা। বর্তমানে মোসলেম বোলে পরিচিত জাতিটিতে এ দু'টি শর্তের একটিও নেই। তাই আল্লাহর দেয়া এই সংজ্ঞা মোতাবেক এই জাতি মো'মেন নয়। আর মো'মেন না হওয়ার অর্থ হয় মোশরেক না হয়

কাফের। তাছাড়াও আল্লাহ কোর'আনে কাফেরের যে সংজ্ঞা দিচ্ছেন তা হোলো - আল্লাহ যে বিধান নাযেল কোরেছেন তা দিয়ে যারা হুকুম করে না অর্থাৎ শাসনকার্য, বিচার ফায়সালা পরিচালনা (এখানে বিচার অর্থে আদালতের বিচার, শাসনকার্য সব বুঝায়, কারণ শব্দটা হুকুম) করে না তারাই কাফের, জালেম, ফাসেক (সুরা মায়েদা- ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এই আয়াতের অর্থে সমস্ত পৃথিবীর মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যার প্রকৃত অবস্থা কি তা আপনারাই বোলুন।

রসুলাল্লাহ যে জাতিটি রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন সে জাতির মধ্যে কোর'আনের লিখিত একটিও কপি ছিলো না, কোন হাদিস গ্রন্থও ছিলো না এবং পড়ালেখা জানা মানুষ ছিলেন বড়জোর চল্লিশজন। তারা আল্লাহ-রসুলের হুকুম যে যতটুকু জানতেন ততটুকুই মেনে চোলতেন। তাদের জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম কোরে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাদের সেই কাজের ফলে আল্লাহ তাদেরকে অর্ধপৃথিবীর শাসনক্ষমতা দান কোরেছিলেন। পক্ষান্তরে বর্তমানের এই জাতির মধ্যে কোটি কোটি লোক লেখা পড়া জানে, লক্ষ লক্ষ লোক উচ্চ-শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আইনজ্ঞ, বিজ্ঞানী, শিল্পী এবং লক্ষ লক্ষ মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, হাফেজে কোর'আন, ফকিহ, মোহাদ্দেস, আলেম ওলামা, পীর-মাশায়েখ ইত্যাদি সবই আছে। তাদের কাছে কোর'আনের কোটি কোটি কপি, হাদিস, ফেকাহ, মাসলা-মাসায়েল, ওয়াজ মাহফিল, যিকির-আজকার ইত্যাদির কোন অভাব নেই কিন্তু এই জাতির হাতে সেই শাসন ক্ষমতা কোথায়, সেই পরাক্রম কোথায়? রূঢ় বাস্তবতা হোচ্ছে এ সবকিছু নিয়েই এই জাতি পৃথিবীর সর্বত্র অন্যান্য জাতিগুলির পায়ের নিচের গোলাম হোয়ে আছে।

অন্যান্য জাতিগুলির আগ্রাসনের ভয়াবহতার কথা বাদ দিলেও মোসলেমদের নিজেদের মধ্যকার ফেরকা-মাজহাব নিয়ে যে দাঙ্গা সহস্রাধিক বছর ধোরে চোলছে তাতেও লক্ষ লক্ষ মোসলেমের প্রাণ ও রক্ত ঝোরছে। ইরাকে, সিরিয়ায়, পাকিস্তানে ভিনদেশী শত্রু নয়, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে গণহত্যা কোরে চোলেছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হোচ্ছে আমাদের আলেম সমাজ এ বিষয়গুলি সম্পর্কে একেবারেই নির্লিপ্ত। এমন কি তারা নিজেরা যে সমাজে বাস করেন, সেই সমাজে বিরাজিত অন্যায়, অবিচার, হানাহানির বিরুদ্ধেও একেবারে নির্বিকার, সেগুলি দূর করার জন্য তাদের মধ্যে কোনরূপ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। তারা ব্যস্ত নামাজ, রোজা, মিলাদ, যিকির ইত্যাদি ধর্মকর্ম নিয়ে। কিন্তু শুধুমাত্র নামাজ, রোজা কোরে জীবন পার কোরে দেওয়ার জন্যই কি উম্মতে মোহাম্মদীর জন্ম হোয়েছিল? না, সমগ্র পৃথিবী থেকে অন্যায়, অবিচার, রক্তপাত, হানাহানি এক কথায় সকল প্রকার অশান্তি দূর কোরে মানুষকে শান্তি দেওয়ার জন্যই এ জাতির উন্মেষ। সেই শান্তি আজ কোথায়? আর শান্তি আনার জন্য এ জাতির আলেম-ওলামাদের ভূমিকাই বা কী? যখন মানবতা ভূলুণ্ঠিত, আর্ত মানুষের ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত, নিষ্পাপ শিশুর রক্তে সিক্ত হোয়ে আছে পৃথিবীর মাটি, ধর্ষিতার লজ্জায় দুনিয়া অন্ধকার তখন যারা মসজিদে বোসে হালকায়ে যিকিরের রব তুলছেন, যারা নিভৃত গৃহকোণে এতেকাফ কোরছেন, যারা হজ্বে গিয়ে সাফা-মারওয়া প্রদক্ষিণ কোরছেন, যারা গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ গুজারি হোচ্ছেন, কঠিন অধ্যবসায় করে মহা-আলেম হোচ্ছেন, তারা মনে রাখবেন এ সব পণ্ডশ্রম। আল্লাহর ওসবে দরকার নেই। মানুষের কল্যাণের জন্যই ধর্ম। যখন পৃথিবীতে মানুষেরই ন্যূনতম অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব হোচ্ছে না, নিষ্পাপ শিশুর রক্তে পৃথিবীর মাটি সিক্ত হোয়ে আছে, এই ঘোর সঙ্কটমুহূর্তে স্বার্থপরের মতো শুধু নিজেদের আত্মশুদ্ধি, নিজেদের পরকাল নিয়ে চিন্তা কোরলে হবে না। পরকালের মুক্তির শর্তই হোচ্ছে দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এ অবস্থায় আলেম সমাজের অবশ্যই কিছু করণীয় আছে, দায়বদ্ধতা আছে। যেভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ফেরকা মাজহাবের মোসলেমরা একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছে এবং নিজেদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলির আগ্রাসনের শিকার হোচ্ছে, তাতে এ জাতির নিশ্চিহ্ন হোতে সময় লাগবে না। সাতশ' বছর স্পেন শাসন কোরেছে মোসলেমরা। তারপরও তাদেরকে সেখান থেকে এমনভাবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নির্মূল করা হোয়েছিল যে সমগ্র স্পেনে একটাও মোসলেম খুঁজে পাওয়া যেত না। সুতরাং এখন সর্বপ্রথম এবাদত হোচ্ছে মানুষকে এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করা। এ অবস্থা থেকে বাঁচতে হোলে আমাদেরকে যে কোনো উপায়েই হোক সকল বিভক্তি ভুলে ঐক্যবদ্ধ হোতে হবে।

একতাই বল, ঐক্যবদ্ধ না থাকার কারণেই এই মোসলেম জাতি সংখ্যায় ১৬০ কোটি হোয়েও দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন, ঘৃণিত। এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এই মোসলেম জাতির দুরবস্থার সঠিক কারণ তুলে ধোরেছেন এবং এ থেকে মুক্তির পথও দেখিয়েছেন। তিনি বোলেছেন, বর্তমানে এসলাম বোলে যে ধর্মটি আমরা পালন কোরে চোলেছি সেটা বহু আগেই কেবল বিকৃত নয়, একেবারে বিপরীতমুখী হোয়ে গেছে। এই বিকৃতি থেকে বেরিয়ে প্রকৃত এসলামে না ফিরে গেলে এ জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। আমরা যামানার এমামের অনুসারীরা এই সত্যটি অনুধাবন কোরেই এ শতধাবিচ্ছিন্ন মানবজাতিকে আল্লাহর প্রকৃত শিক্ষার উপর ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। জাতির অস্তিত্ব যখন সঙ্কটে, যখন জাতির সকলেই চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত, তখন আমরা যদি রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ধর্মীয় মাসলা মাসায়েল নিয়ে নিজেদের মধ্যে ফেরকা-মাজহাবের প্রাচীর তুলে রাখি তাহোলে কার লাভ? সুতরাং আমাদের উচিৎ অনৈক্যের পথ না খুঁজে কিভাবে, কোন পথে ঐক্যবদ্ধ হোতে পারি সর্বান্তকরণে সেই পথ খোঁজা। মানবজাতির সকলেই এক বাবা মা আদম হাওয়ার সন্তান। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ কোরে এক সত্য জীবনব্যবস্থার অধীনে আনার জন্যই এসেছিলেন আখেরী নবী, বিশ্বনবী (দ:)। তাঁর এই কাজকে সম্পন্ন করার জন্য তিনি উম্মতে মোহাম্মদী নামে লৌহকঠিন ঐক্যবদ্ধ জাতি তৈরি কোরলেন। তারপর মহান প্রভুর কাছে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড গতিশীল, প্রাণবন্ত, সামরিক শক্তিতে দুর্দান্ত একটি জাতিকে রেখে গেছেন যারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অর্ধ পৃথিবীর শাসকে পরিণত হোয়েছিল এবং জ্ঞানে বিজ্ঞানে অন্যান্য সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হোয়েছিল। অথচ আজ **একদিকে স্বার্থের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির হানাহানি, রাজনীতির নামে চলছে বাণিজ্য অন্যদিকে ধর্মের ধারক-বাহক আলেম ওলামাদের চলছে ধর্মবাণিজ্য তাহলে এখন হতভাগ্য এই জাতির বাঁচার উপায় কী? আপনারাই বলুন**। আমরা হেযবুত তওহীদ সেই প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী হওয়ার জন্য চেষ্টা কোরছি। আমরা সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এক স্রষ্টার বান্দা হিসাবে তাঁর বিধানের দিকে ফিরে যাওয়ার কথা বোলছি। আমরা বোলছি, আমাদের নিজেদের জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিময় জীবন পেতে হোলে আমাদেরকে অবশ্যই পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রষ্টাহীন, বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থাগুলিকে প্রত্যাখ্যান

কোরতে হবে। আপনারাও আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হোন এটা আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা। আপনারা কবে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, মাদ্রাসায় বোসে যে কেতাব আপনারা মুখস্ত কোরছেন সেই কেতাব দুনিয়ার কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই, সেটা আগে প্রতিষ্ঠা কোরুন। যে সংবিধান প্রতিষ্ঠিত নেই তার ধারা উপধারা মুখস্ত কোরে তা নিয়ে গবেষণা কোরে কী লাভ? যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বই নেই, সেখানে শরিয়তের মাসলা-মাসায়েল নিয়ে কূটতর্ক, ফেরকা, মাজহাব নিয়ে বিভক্তি, লেবাস ইত্যাদি নিয়ে মতভেদ এক চরম নির্বুদ্ধিতা। আপনারা জীবনের বহু মূল্যবান বছর ব্যয় কোরে যে জ্ঞান অর্জন কোরছেন, মুখস্ত বিদ্যা অর্জন কোরছেন সে মুখস্তবিদ্যা জাতির কোন কাজে আসছে? এ মুখস্ত বিদ্যা দিয়ে আপনারা আল্লাহর নিষেধ সত্ত্বেও রোজগার কোরে খাচ্ছেন- এটাই কি এলেম হাসিলের উদ্দেশ্য? কেতাবের জ্ঞান আছে বোলে অহংকারে স্ফীত হয়ে লাভ নেই। কারণ যে জ্ঞান মানবজাতির কল্যাণে কাজে লাগে না বরং দুনিয়াবি সম্পদ হাসিলের মাধ্যম হয়, মানবজাতির সেই জ্ঞানী আলেমকে কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই তাদেরকে আল্লাহরও প্রয়োজন নেই। আল্লাহর রসুল উম্মতে মোহাম্মদী জাতি সৃষ্টি কোরেছেন সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করার জন্য। কিন্তু আপনারা সেই সংগ্রাম ত্যাগ কোরেছেন এবং নিজেরা দাড়ি, টুপি, জোব্বা পরে, গায়ে আতর খোশবু লাগিয়ে নায়েবে রসুল সেজে বোসে আছেন। রসুল কি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন? এখন জাতির এই সঙ্কটকালে সকল আত্মকেন্দ্রিকতা ত্যাগ কোরে প্রকৃত এবাদতে ফিরে আসুন, যে এবাদত করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি কোরেছেন অর্থাৎ মানবতার কল্যাণ সাধন।

ধর্ম ও মানবজাতি সম্পর্কে যে মহাসত্যগুলি আমরা তুলে ধোরেছি সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বোলে সত্য থেকে বিমুখ হওয়া উচিৎ নয়। আল্লাহ বোলেছেন, নিজের বিরুদ্ধে গেলেও সত্যের সাক্ষ্য দিতে (সুরা নেসা ১৩৫)। আর আমরা যা বোলছি সেটা আমাদের কথা নয়, আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা বোলেছেন আমরা সেটারই উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আপনারা আল্লাহ-রসুলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবেন না। আমরা কোর'আন হাদিস থেকে প্রমাণ কোরে দিয়েছি যে, প্রচলিত এসলাম এসলাম নয় এবং ধর্মকে জীবিকার মাধ্যমে পরিণত করা হারাম। আমরা মাদ্রাসার প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধোরেছি যে, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশদের একটি ষড়যন্ত্রের ফল। ১৭৮০ সনে তারা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরেছে, ১৪৬ বছর ব্রিটিশরাই এ জাতিকে এসলাম শিখিয়েছে এবং সেখানে যে সিলেবাস ও কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হোয়েছে সেটাও ব্রিটিশ খ্রিস্টান পণ্ডিতদের তৈরি, ওখানে কখনোই প্রকৃত এসলাম শিক্ষা দেওয়া হয় নি। তাদের এই শিক্ষাব্যবস্থা আপনাদেরকে হারাম উপার্জনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, আপনারা এক প্রকার বাধ্য হোয়েই ধর্মকে জীবিকার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার কোরে চোলেছেন। কেননা এর বাইরে আর কোন কর্মমুখী শিক্ষা আপনাদের মাদ্রাসায় দেওয়া হয় নি। আমাদের অনুরোধ, মাদ্রাসার ইতিহাস পড়ে দেখবেন, তাহোলেই বুঝতে পারবেন ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে কীভাবে এই জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে ব্রিটিশরা। সত্যানুসন্ধী মন নিয়ে যদি আপনারা আমাদের লেখাগুলি পড়েন তাহোলে অবশ্যই সত্য ও মিথ্যা, সঠিক ও বিকৃতির পার্থক্য আপনাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে। আমাদের কোন বক্তব্যকে আজ পর্যন্ত কেউ যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বাতিল কোরতে পারে নি, তাই অক্ষম আক্রোশে ক্ষিপ্ত হোয়ে অনেক ধর্মব্যবসায়ী মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে নেমেছেন। আল্লাহর সমস্ত নবী-রসুল ও তাঁদের উম্মাহর বিরুদ্ধেও ধর্মব্যবসায়ীরা অপপ্রচার কোরেছে। এ নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। তাদের প্রতি আমাদের একটাই কথা, আপনারা যারা ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হোয়ে সত্যের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হোয়েছেন আপনারা আপনাদের ইহকাল ও পরকাল অর্থাৎ দুই জীবনের ক্ষতিই কোরছেন। আল্লাহ সূক্ষ্ম হিসাব গ্রহণকারী, আপনারা কেন সত্যের বিরুদ্ধে নেমেছেন সেটা আল্লাহ অবগত আছেন। অতএব, আপনাদের মঙ্গলের জন্যই নিবৃত হোন এবং মানুষের ভালো-মন্দ, গ্রহণ-বর্জনের সিদ্ধান্ত তাদেরকে নেওয়ার সুযোগ দিন। সাধারণ মানুষকে বোকা মনে কোরবেন না, তাদের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝার মত জ্ঞান অনেকেরই আছে। ধর্মের প্রকৃত সত্যগুলি তুলে ধরা যেমন আমাদের সাংবিধানিক অধিকার তেমনি আমরা যা বোলি, যা কোরি, যা লিখি সেটা জানাও মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। আমরা যে মহাসত্য লাভ কোরেছি তা প্রতিটি মানুষকে জানিয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। সেটা কে গ্রহণ কোরবে কে কোরবে না এটা মানুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির ব্যাপার। কারও মনের উপর জোর চলে না। মানুষ যদি আমাদের বক্তব্য জানার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তবে সেখানে আমাদের কিছু বলার থাকবে না। অন্ততঃ আমরা আল্লাহর কাছে সাফ থাকবো। কাজেই মানুষকে জানতে দিন। আমাদের কথা, কাজ ও লেখাকে বিকৃতভাবে মানুষের কাছে উপস্থাপন কোরবেন না, এটা অপরাধ। আল্লাহ বোলেছেন, তোমরা জেনেশুনে সত্য গোপন কোর না, সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশ্রিত কোর না (সুরা বাকারা ৪২)। এর থেকে বড় অন্যায়, অপরাধ (Crime) আর নেই। তাছাড়া এসলাম আপনাদের একার নয়, এসলাম সব মানুষের জন্য। আপনারাও প্রকৃত এসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে মানবজীবন স্বার্থক কোরুন। সত্যনিষ্ঠ আলেমদেরকে মাননীয় এমামুয্যামান শ্রদ্ধা কোরতেন, আমরাও প্রকৃত আলেমদেরকে অবশ্যই শ্রদ্ধা কোরি। সেই সত্যনিষ্ঠ আলেমদের প্রতি আমাদের আহ্বান, আপনারা আর পিছিয়ে থাকবেন না। আমাদের কোন লেখায় কারও দ্বিমত থাকলে যথাযথ তথ্য, যুক্তি দিয়ে আমাদেরকে অবহিত কোরুন, পরামর্শ দিন। আমরা সকলের যে কোন যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ, উপদেশ সাদরে বিবেচনা কোরতে তৈরি আছি। তবুও অপপ্রচার কোরে সত্য প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত কোরবেন না। আপনারা আমাদের সঙ্গে আসলে আমাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে, আমাদের কাজের গতি আরও বাড়বে। ১৬০ কোটির এই বিরাট জাতি অর্ধপৃথিবী জুড়ে একটি বিরাট লাশের মত পড়ে আছে। অন্য সবজাতির লোকেরা যে যেভাবে পারছে এই লাশকে মারছে, পেটাচ্ছে, পদাঘাত কোরছে। এই জাতি আর কতকাল লাশ হোয়ে থাকবে? আমরা যামানার এমামের অনুসারীরা এই লাশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য চেষ্টা কোরছি, যেন সে আবার তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার কোরতে পারে। এই কাজ শুধু আমাদের একার নয়, আপনাদেরও। আসুন, এই লাশটির মধ্যে আমরা প্রাণ সঞ্চার কোরি। আপনারা যদি স্বার্থচিন্তা পরিহার কোরে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন-সম্পদ কোরবান কোরে অগ্রসর হন, আপনাদের সম্মান ও মর্যাদা থাকবে সবার উর্ধ্বে। আমাদের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য থাকবে, আমরা বিজয়ী হবোই এনশা'আল্লাহ।

[লেখক: যামানার এমামের অনুসারী ও আমীর, হেযবুত তওহীদ, যোগাযোগ: হেযবুত তওহীদ, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৭৮২১৮৮২৩৭, ০১৫৫৯৩৫৮৬৪৭, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩]

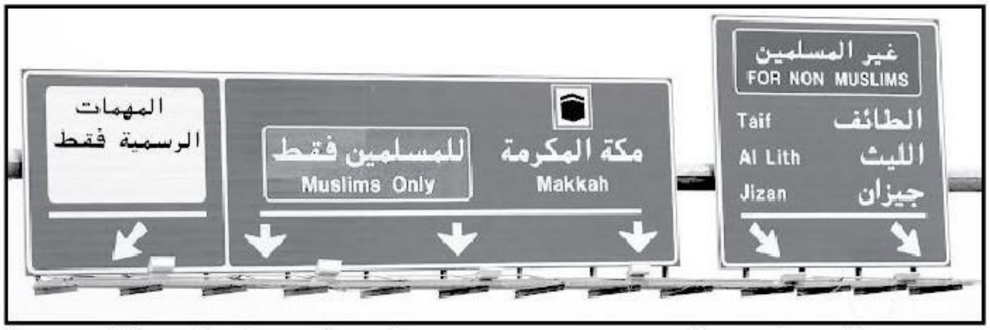

[উপরের ছবিটি একটি সাইনবোর্ডের। এটি আরাফাতের অনেক দূরে অবস্থিত। সাইনবোর্ডটির বাম পাশে আরাফাতের ময়দানের দিকে যাওয়ার পথের শুরুতে লেখা আছে, Muslims only (শুধুমাত্র মোসলেমদের জন্য), ডান পাশে নির্দেশ দেওয়া আছে অমোসলেমদের অন্যদিকে যাওয়ার জন্য। অর্থাৎ কোনভাবেই যেন মোসলেম ছাড়া অন্য কেউই আরাফাতের ময়দানে যেতে না পারে।] কেন এই ব্যবস্থা? তারই উত্তর জানতে নিম্নের এই লেখাটি--

মোশরেকদের হজ্বে যাওয়া নিষেধ

এম আমিনুল এসলাম

নামাজ, রোজা, যাকাত, জুমআ, ঈদ কোরবানির মতো হজ্ব সম্পর্কেও এই মোসলেম নামধারী জাতিটির আকীদা আজ বিকৃত হয়ে গেছে। আল্লাহর রসুল আর তাঁর প্রকৃত উম্মাহর হজ্ব আর বর্তমানের এই নামধারী মোসলেমদের হজ্বের মাঝে আকাশ পাতাল ফারাক। তবে এসলাম-পূর্ব যুগের কাফের মোশরেকদের হজ্বের সঙ্গে এই বর্তমানের হাজীদের হজ্বের উল্লেখযোগ্য মিল রয়েছে। ঐ আরবরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বে বিশ্বাস করত, কা'বাকে আল্লাহর ঘর বলে বিশ্বাস করত; কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ পড়তো; আল্লাহর রাস্তায় পশু কোরবানি করত; সওম (রোজা) পালন করত; খতনা করত, তারা প্রতি কাজে আল্লাহর নাম নিত। তবু তারা মোশরেক ছিল কারণ তাদের জাতীয় জীবনে আল্লাহর হুকুম মান্য করত না, তাদের গোত্রপতি ও পুরোহিতদের মনগড়া বিধান দিয়ে জীবন পরিচালনা করত। তারা লাত, মানাত, হাবল, ওজ্জা নামে যে মূর্তিগুলোর পূজা করত সেগুলিকে আল্লাহ বলে মানতো না, তারা বিশ্বাস করত ওগুলি আল্লাহর নিকটবর্তী, ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়জন তাই তাদের উপাসনা করলে সেগুলি আল্লাহর সান্নিধ্য এনে দেবে এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হবে। আজ যেমন এই জাতির এলাহ হল দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' আর তাদের দীন হল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র, আমীরতন্ত্র ইত্যাদি।

মো'মেনের হজ্ব বনাম মোশরেকের হজ্বঃ

রসুলাল্লাহ তাঁর নবুয়ত লাভের পর থেকে মদীনায় রাষ্ট্র গঠন করা পর্যন্ত কোন হজ্ব করেন নি। মোশরেকদের হজ্বের সময় তিনি এবং তাঁর আসহাবরা সেখানে গিয়ে মোশরেক হাজীদেরকে তওহীদের আহ্বান জানাতেন, কিন্তু কখনও তাদের সঙ্গে হজ্বের আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নিতেন না। এই সময় রসুলাল্লাহ হজ্ব, যাকাত, জুমআ, ঈদ, কোরবানি তো দূরের কথা মানুষকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মেনে নেবার দাওয়াত দেয়া ছাড়া আর কোন কাজই করেন নি। অতঃপর যখন মদীনার মানুষ রসুলাল্লাহর এই ডাক গ্রহণ করে নিল, তারা তাদের জাতীয় জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে তসলিম করে নিল তখন আসলো জুমআ, যাকাত এবং হজ্বের নির্দেশ।

শেষ এসলামের হজ্বের বিধান আসার আগে মোশরেকদের হজ্ব হত কা'বায়, আরাফাতে নয়, আজও অনেকটা সে অবস্থাই হয়ে গেছে, হজ্ব বলতে মানুষ কা'বা তওয়াফকেই বুঝে থাকে, বাকি সব আনুষঙ্গিক। শেষ নবী (দঃ) হজ্বকে নিয়ে গেলেন আরাফাতের ময়দানে, কিন্তু হজ্বের অঙ্গ হিসাবে কোরবানি, কা'বা তওয়াফ ঠিক রইল। প্রাক-এসলামের হজ্বের সঙ্গে এসলামের 'হজ্বের' আনুষ্ঠানিকতায় খুব বেশি তফাৎ ছিলো না, এখনও নেই। আসমান জমিনের তফাৎ এসে গেলো দু'টো বিষয়ে, দু'টো আকীদায়। একটা হল- কা'বার ভেতরের মূর্তিগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল, দ্বিতীয় হল মোশরেকদের পাপমুক্তির 'এবাদতের' বদলে একে করা হল বিশ্ব-মোসলেমের বার্ষিক মহাসম্মেলন। যেহেতু মোসলেমের দীন ও দুনিয়া এক, কাজেই এ মহাসম্মেলনের রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনগত অর্থাৎ জাতীয় দিকটার সঙ্গে মোসলেমের ব্যক্তিগত আত্মার দিক অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। তাই মোসলেম হজ্বে যেয়ে যেমন উম্মাহর জাতীয় সমস্ত সমস্যার সমাধানে অংশ নিবে, তেমনি আরাফাতের ময়দানকে হাশরের ময়দান মনে করে নিজেকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত বলে মনে করবে। মনে করবে মোসলেম হিসাবে, উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত ছিলো অর্থাৎ সংগ্রাম করে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা, তার কতটুকু সে পূরণ করতে পেরেছে সে হিসাব তাকে আজ দিতে হবে। আইয়ামে জাহেলিয়াতের মোশরেকেরা উলঙ্গ হয়ে হজ্ব করত এই কারণে যে, হাশরের ময়দানে সমস্ত নারী-পুরুষ উলঙ্গ থাকবে। এসলাম শুধু দু'টুকরো সেলাইবিহীন কাপড় দিয়ে সেটাকে শালীন করেছে। জাতীয় জীবনের সবকিছু বাদ দিয়ে আজ হজ্ব আবার উলটো সেই মোশরেকদের হজ্বের মতো শুধু ব্যক্তিগত এবাদতে ফিরে গেছে।

মানুষের প্রতি আল্লাহর ঘোষণাঃ

পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ হজ্বের দিনের জন্য ঘোষণা করেছেন যে, 'মহান হজ্বের দিবসে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এ ঘোষণা যে, নিশ্চয়ই মোশরেকদের সম্পর্কে আল্লাহ দায়মুক্ত এবং তাঁর রসুলও (তওবা- ৩)'। অর্থাৎ তাদের কোন কাজের ব্যাপারেই আল্লাহ এবং রসুল কোন দায়িত্ব নেবেন না, সেই কাজ ভাল-মন্দ যাই হোক না কেন। সুতরাং যেই মোশরেকদের সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রসুল দায়মুক্ত তাদের জন্য হজ্বের কোন নির্দেশ নেই এটা সাধারণ জ্ঞানেই বুঝা যায়।

মোশরেকদের হজ্বে যাওয়া নিষেধঃ

আল্লাহ মো'মেনদেরকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'হে মোমেনগণ! মোশরেকরাতো অপবিত্র; সুতরাং এই বৎসরের পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে (তওবা- ২৮)।' আল্লাহর এই নির্দেশ মোতাবেক কোন মোশরেক যাতে হজ্বে যেতে না পারে সে ব্যাপারে মো'মেনদের জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় মো'মেনরা যখন প্রকৃত হজ্ব করতেন তখন মোসলেম ছাড়া অন্য কেউ যেন সেখানে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সীমানা নির্দিষ্ট করা ছিল।

কেন এই নিষেধাজ্ঞা?

আজ যে ব্যক্তিগত 'এবাদতের' আকীদায় হজ্ব করা হয় তা যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উদ্দেশ্য নয় তার আর এক প্রমাণ হল মক্কা ও আরাফাতের চারদিক দিয়ে বহু কিলোমিটার জুড়ে একটি এলাকাতে অমোসলেমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। এই নিষিদ্ধকরণের উদ্দেশ্য কী? মোসলেমদের হজ্ব করার দৃশ্য অমোসলেমদের দেখাতে মোসলেমদের ক্ষতি কী? মোসলেমদের জামাতের নামাজের দৃশ্য সাম্যের, মানুষে-মানুষে ভ্রাতৃত্বের, ঐক্য ও শৃঙ্খলার এক অপূর্ব দৃশ্য। শুধু নামাজের দৃশ্য দেখেই বহু অমোসলেম মুগ্ধ হয়ে এসলাম সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে, পড়াশোনা করে, মোসলেম হয়ে গেছে। তা হোলে এই নিষিদ্ধকরণের কী অর্থ? এক কথায় এর অর্থ রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা (State Secret)। যে জাতিটি দুনিয়ার অন্য সবরকম জীবনব্যবস্থা ভেঙ্গে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত সে জাতির বার্ষিক মহাসম্মেলনে অবশ্যই বহু বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ হবে, সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যেগুলো অতি গোপনীয়। এই গোপনীয়তাকে অমোসলেমদের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য এই সতর্কতা। নইলে যে জীবনব্যবস্থা, দীনকে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেবার কথা সেটার কেন্দ্রস্থলকে আড়াল করে রাখার কোন মানে হয় না। হজ্ব যদি জাতীয়, রাজনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি গোপনীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপার না হতো, শুধু আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত ব্যাপার হতো তবে ঐ নিষিদ্ধকরণ উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন।

মোশরেক কারা?

সুরা বাকারার ৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন– "তবে কি তোমরা কেতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাহাদের প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা, অপমান এবং কেয়ামতের দিন কঠিনতম শাস্তি।" এখানে আল্লাহ পার্থিব জীবনেই যে শাস্তির কথা বলছেন, আজ মোসলেম বলে পরিচিত এই জাতির অবস্থা কি ঠিক তাই নয়? আল্লাহর দেওয়া বিধান হল আল কোর'আন। এই কোর'আনের কিছু মানা, কিছু না মানাই হল শেরক। এ ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে–"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; এটা ছাড়া সব কিছু তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন (সুরা নেসা ৪৮, ১১৬)। আল্লাহর দেওয়া বিধান কোর'আন থেকে নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত এই কয়েকটি বিধান এ জাতি ব্যক্তিগতভাবে পালন করে, তাও বিকৃতরূপে কিন্তু জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহর দেওয়া বিধান যেমন অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি বাদ দিয়ে মানুষের এবং খ্রিস্টান ও ইহুদিদের তৈরি বিধান মেনে চলছে। সুতরাং এই জাতি আল্লাহর কোর'আনের কিছু অংশ মানার আর কিছু অংশ না মানার কারণে কার্যতঃ মোশরেক হয়ে আছে। পক্ষান্তরে যারা বিনা শর্তে আল্লাহর সকল হুকুমের প্রতি গর্দান পেতে দেয় তারা হল মোসলেম। এই সংজ্ঞা সবার জানা, প্রায় সব আলেম সাহেবরাই ওয়াজে বক্তৃতায় এ কথা বলে থাকেন। এই সংজ্ঞা মোতাবেকই এই জাতি মোসলেম নয়, কারণ তারা তাদের গর্দান পেতে দিয়েছে ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা' দাজ্জালের হুকুমের প্রতি, আল্লাহর হুকুমের প্রতি নয়।

হজ্বের এলাকায় যাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ

সকল আইনে সংরক্ষিত স্থানে অবৈধ অনুপ্রবেশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কা'বার কর্তৃপক্ষ মহান আল্লাহ। তিনি সমস্ত মানবজাতির মিলনস্থল হিসাবে কা'বাকে স্থাপন করেছেন। কাজেই আরবের রাজা-বাদশাহরা কা'বার বৈধ কর্তৃপক্ষ নয়, মোতওয়াল্লীও নয়। যেহেতু আল্লাহ মোশরেকদেকে হজ্বে যেতে নিষেধ করেছেন সেহেতু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে হজ্বের জন্য তাঁর নির্ধারিত এলাকায় অনুমতিহীন প্রবেশের জন্য এই জাতি শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সকল সামষ্টিক হুকুম অমান্য করে এই জাতি দুনিয়াতে অপদস্ত অপমানিত লাঞ্ছিত হয়েছে এবং হচ্ছে, আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করছে। হজ্ব করতে গিয়ে তারা আল্লাহর আরেকটি নির্দেশ অমান্য করছে এবং নিষ্পাপ হওয়ার বদলে তা তাদের শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। এই সাইনবোর্ডেও লেখা আছে যে ***'সংরক্ষিত এলাকা, শুধু মোসলেমরা অনুমতিপ্রাপ্ত'।*** প্রশ্ন হচ্ছে, সারা দুনিয়া থেকে এই হজ্বের মৌসুমে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্রের পূজারী যে হাজীরা মক্কাশরীফে হজ্ব করতে যান, তারা কি মোসলেম? তাদের কি সেখানে প্রবেশাধিকার আছে? তারা প্রত্যেকেই যার যার দেশে আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র হুকুম, আইন-কানুন, সংবিধান মেনে নিয়েছেন। লাত, মানাত, হাবল, ওজ্জা ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজারীরা যদি কাফের মোশরেক হয়, তাহোলে এই সব তন্ত্র-মন্ত্রের পূজারীরা মোসলেম হয় কি করে? আরবের ঐসব মোশরেকরা যদি আরাফাতের ত্রিসীমানায় ঢুকতে না পারে, তবে এই সময়ের মোশরেক কাফেরদেরকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি কে দিয়েছে? এই যে সারা আরব বিশ্বজুড়ে, আফ্রিকা, এশিয়ার সর্বত্র মোসলেম নামাধারীদের নিজেদের মধ্যে এত হানাহানি, যুদ্ধ, রক্তপাত চলছে তা নিরসনের জন্য নিজেরা বোসে পবিত্র আরাফাতের ময়দানে সমাধান করতে পারে না? কিন্তু তাদের কল্পনার মধ্যেও সেটা নেই। তারা নিজেদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য দাজ্জালের দ্বারস্থ হন। তারা মুখে কা'বাকে কেবলা বলে থাকলেও তাদের প্রকৃত কেবলা এখন পাশ্চত্য সভ্যতা। তাদের প্রভুও এখন আর আল্লাহ নন, তাদের প্রকৃত প্রভু এখন ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা' দাজ্জাল। সুতরাং দাজ্জালের এই পূজারীদের কোন অধিকার নেই মক্কা, আরাফাতে, হুজুরের (দঃ) পবিত্র রওজা শরীফে গিয়ে সেই পূণ্যভূমির পবিত্রতা হানি করার।

[লেখক: ইসলামি চিন্তাবিদ, যামানার এমামের অনুসারী, হেযবুত তওহীদের সদস্য। যোগাযোগ: ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩]

শহীদী ঈদ
কাজী নজরুল ইসলাম

শুধু আপনারে বাঁচায় যে,
মুসলিম নহে, ভণ্ড সে!
ইসলাম বলে, 'বাঁচো সবাই!
দাও কোরবানি জান্ ও মাল,
বেহেশত্ তোমার করো হালাল।
স্বার্থপরের বেহেশ্ত্ নাই।
নামাজ-রোজার শুধু ভড়ং,
ইয়া উয়া পরে সেজেছ সং,
ত্যাগ নাই তোর এক ছিদাম!
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করো জড়ো
ত্যাগের বেলাতে জড়সড়!
তোর নামাজের কি আছে দাম?
খেয়ে খেয়ে গোশ্ত্ রুটি তো খুব
হয়েছ খোদার খাসি বেকুব,
নিজেদের দাও কোরবানি।
বেঁচে যাবে তুমি বাঁচিবে দ্বীন,
দাস ইসলাম হবে স্বাধীন,
গাহিছে কামাল এই গানই!

উম্মতে মোহাম্মদীর গৌরবময় অতীত ও বীভৎস বর্তমান

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

আমাদের, অর্থাৎ আমরা যারা নিজেদের মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে মনে কোরি, আমাদের ইতিহাস কি? আমরা কোথা থেকে এসেছি, কেমন কোরে আমাদের জন্ম হোয়েছে, কেন আমাদের সৃষ্টি করা হোয়েছে, কি উদ্দেশ্যে আমাদের একটি জাতি হিসেবে গঠন করা হোয়েছে? আজকের এই প্রায় ১৬০ কোটির জাতির মনে এই প্রশ্নগুলি জাগে না। **কেউ এই প্রশ্নগুলি কোরলে একশ' ষাট কোটির কাছ থেকে অন্তত দশকোটি রকমের বিভিন্ন উত্তর পাওয়া যায়।** চৌদ্দশ' বছর আগে যখন এই জাতিটির জন্ম হোয়েছিল আল্লাহর রসুল তার অক্লান্ত চেষ্টা, অতুলনীয় ত্যাগ, অবিচল নিষ্ঠা, অটল অধ্যবসায় এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এই জাতিটিকে গঠন কোরেছিলেন তখন কিন্তু ঐ জাতির প্রত্যেকটি মানুষকে উপরোক্ত ঐ প্রশ্নগুলি কোরলে সবাই একই উত্তর দিতেন, কোন মতভেদ ছিল না। ঐ জাতির ইতিহাস হোচ্ছে এই যে, জাতিটি গঠিত হবার পঁচিশ বছরের মধ্যে তদানীন্তন পৃথিবীর দুইটি মহাশক্তিকে সশস্ত্র সংগ্রামে, যুদ্ধে পরাজিত কোরে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় আল্লাহর আইনের শাসন কার্যকরী কোরেছিল। ঐ মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য দুইটি ছিল রোমান ও পারসিক, রোমান শাসকরা খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী দাবি কোরলেও তারা কিন্ত ঈসা আ. এর প্রকৃত অনুসারী ছিলো না, যাই হোক একটি খ্রিস্টান অপরটি অগ্নি উপাসক। সংখ্যায়, সম্পদে, সামরিক বাহিনীর সংখ্যায়, অস্ত্রশস্ত্রে, এক কথায় সবদিক দিয়ে ঐ দুইটি বিশ্বশক্তি ছিল ঐ শিশু জাতির চেয়ে বহুগুণে বড় কিন্তু তবুও তারা ঐ সদ্য প্রসূত ছোট্ট জাতির সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হোয়ে গিয়েছিল। তারপর ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ঐ জাতিটি তখনকার দিনের অর্ধেক পৃথিবী জয় কোরে স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার এক কথায় শান্তি প্রতিষ্ঠা কোরলো। এই পর্যন্ত ঐ জাতির ইতিহাস তাদের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সামরিক বিজয়ের ইতিহাস।

উম্মতে মোহাম্মদীর এই সংগ্রাম কিসের লক্ষ্যে?

প্রশ্ন হোলো উম্মতে মোহাম্মদীর ঐ সামরিক বিজয়ের উদ্দেশ্য কি ছিলো? সাম্রাজ্য? নাকি অন্য ধর্মের লোকজনকে এসলাম গ্রহণে বাধ্য করা? না, এর কোনটাই নয়। এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ছিলো ঠিক তাই যে উদ্দেশ্য, যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহর নির্দেশে তাঁর শেষ রসুল এই জাতিটিকে, এই উম্মাহটি গঠন কোরেছিলেন, আর সেটি হোলো সংগ্রাম কোরে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা বা দীন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরী কোরে মানবজাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সমস্ত অন্যায়, অবিচার, শোষণ, অত্যাচার নিঃশেষ কোরে দিয়ে ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আর এই জন্যই এই দীনের নাম এসলাম, আক্ষরিক অর্থেই শান্তি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, আদম (আ:) থেকে মোহাম্মদ (সা:) পর্যন্ত ঐ একই নাম, এসলাম বা শান্তি। **আজ আমাদের ধর্মীয় ও অধর্মীয় (অর্থাৎ রাজনৈতিক) নেতারা যে অর্থে এসলামকে শান্তির ধর্ম বলেন তার ঠিক বিপরীত অর্থ।** উম্মতে মোহাম্মদী মানুষের জাতীয় জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন সংগ্রামের মাধ্যমে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি মানুষকেও তারা তার ধর্ম ত্যাগ কোরে এই দীন গ্রহণে বাধ্য করেন নি। **অর্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রবর্তন করার ফলে ঐ সমস্ত এলাকায় লুপ্ত হোয়ে গেল শোষণ, অবিচার, অন্যায়, নিরাপত্তাহীনতা অর্থাৎ ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা। প্রতিষ্ঠিত হোলো সুবিচার; ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সুবিচার ও নিরাপত্তা; এক কথায় শান্তি।**

উম্মতে মোহাম্মদীর উদ্দেশ্যচ্যুতি

রসুলাল্লাহর ওফাতের ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত উম্মতে মোহাম্মদী একদেহ একপ্রাণ হোয়ে সংগ্রাম চালিয়ে গেল। তারা বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ কোরল। এরপর ঘটলো এক মহাদুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ঐ জাতি হঠাৎ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলে গেল। জাতি ভুলে গেল যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হোয়েছে, গঠন করা হোয়েছে, প্রশিক্ষণ দেয়া হোয়েছে সেই কাজ ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কিন্তু জাতির লোকদের আকিদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা বিকৃত হোয়ে যাওয়ায় জাতি ঠিক তাই কোরল, আল্লাহর দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জেহাদ অর্থাৎ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ত্যাগ কোরল এবং ত্যাগ কোরে অন্যান্য রাজা বাদশাহরা যেমন রাজত্ব করে তেমনি শান শওকতের সঙ্গে তাদের মতোই রাজত্ব কোরতে শুরু কোরল। এই সর্বনাশা কাজের পরিণতি কি তা তারা উপলব্ধি কোরতে পারলেন না। তারা উপলব্ধি কোরতে পারলেন না যে, যে জিনিস যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় সেটা যদি সেটাকে দিয়ে না হয়, তবে আর ঐ জিনিসের কোন দাম থাকে না, সেটা অর্থহীন হোয়ে যায়। একটা ঘড়ির উদ্দেশ্য হোচ্ছে সময় জানা, ঘড়িটা যদি না চলে, সময় না

দেখায়, এমন কি যদি ভুল সময় দেখায় তবে আর সে ঘড়িটার কোন দাম থাকে না। ঘড়িটা সোনা, হীরা জহরত দিয়ে তৈরি কোরলেও না।

মো'মেনের সংজ্ঞা থেকে বিচ্যুতি

শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করার মোহ তাদের এমন ভাবে পেয়ে বসল যে তারা ভুলে গেলেন আল্লাহ কোরআনে মো'মেন হবার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে ঐ জেহাদ অঙ্গীভূত করা আছে। সুরা হুজরাতের ১৫নং আয়াতে আল্লাহ বোলেছেন-"সত্যনিষ্ঠ মো'মেন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তারপর (সে সম্বন্ধে) আর কোন সন্দেহ করে না (অর্থাৎ এ বিশ্বাসের উপর দৃঢ়, অবিচল থাকে) এবং তাদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ (সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) করে।" আল্লাহ প্রদত্ত মো'মেনের এই সংজ্ঞা থেকে জাতি বিচ্যুত হোয়ে গেল।

রসুলাল্লাহর সুন্নাহর বিকৃতি

বিশ্বনবী (সাঃ) তাঁর উম্মাহকে পরিষ্কার কোরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর চলে যাবার পর তিনি যেমন কোরে সংগ্রাম কোরে সমস্ত আরবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা কোরলেন, ঠিক তেমনি কোরে বাকি দুনিয়ায় ঐ দীন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হবে। এটাকে নবীজী (সাঃ) বোললেন "আমার প্রকৃত সুন্নাহ", অর্থাৎ আমি সারা জীবন যা কোরে গেলাম, এবং এও বোললেন যে, যে আমার এই সুন্নাহ ত্যাগ কোরবে সে বা তারা আমার কেউ নয় (বোখারী, মোসলেম); অর্থাৎ আমার উম্মত নয়। তারা উম্মতে মোহাম্মদীর দাবি কোরতে পারে না।

প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম যিনি মহানবী (সঃ) কে রসুল বোলে স্বীকার কোরে এই দ্বীনে তথা এসলামে প্রবেশ কোরলেন; অর্থাৎ আবু বকর (রাঃ) মোসলেম হোয়েই রসুলাল্লাহকে (সাঃ) জিজ্ঞেস কোরলেন- "হে আল্লাহর রসুল! এখন আমার কাজ কি? কর্তব্য কি? মহান আল্লাহর শেষ নবী (সাঃ) উত্তর দিয়ে বোললেন, "এখন থেকে আমার যে কাজ তোমারও সেই কাজ"। ইতিহাসে পাচ্ছি, শেষ এসলামকে গ্রহণ করার দিনটি থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আবু বকরের (রাঃ) কাজ একটাই হোয়ে গিয়েছিল, সেটা ছিল মহানবীর (সাঃ) সংগ্রামে তাঁর সাথে থেকে তাঁকে সাহায্য করা। শুধু আবু বকর (রাঃ) নয়, যে বা যারা নবীজী (সাঃ) কে বিশ্বাস কোরে মোসলেম হোয়েছেন সেই মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বা তারা বিশ্বনবীকে (সাঃ) তাঁর ঐ সংগ্রামে সাহায্য কোরে গেছেন, তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ পালন কোরে গেছেন।

আর কেমন সে সাহায্য! স্ত্রী-পুত্র পরিবার ত্যাগ কোরে, বাড়ি-ঘর সহায়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ কোরে, অর্ধাহারে-অনাহারে থেকে, নির্মম অত্যাচার সহ্য কোরে, অভিযানে বের হোয়ে গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়ে। এই হোলো তাঁর উম্মাহ, উম্মতে মোহাম্মাদী তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ পালনকারী জাতি।

রসুলাল্লাহর বিদায় নেওয়ার ৬০/৭০ বছর পর এই জাতি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ কোরেই ক্ষান্ত হোলেন না। তারা রসুলের সুন্নাহরও ভিন্ন সংজ্ঞা আবিষ্কার কোরলেন। ইতিহাস সাক্ষী যতদিন তিনি এই দুনিয়ায় ছিলেন ততদিন তিনি ও তাঁর আসহাব একদেহ একপ্রাণ হোয়ে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য মাত্র ১০ বছরের মধ্যে ১০৭টি ছোট বড় যুদ্ধ কোরেছেন। তারপর যখন আল্লাহর রসুল এই দুনিয়া থেকে চোলে গেলেন তখন ঐ দায়িত্ব স্বভাবতই এসে পড়লো তাঁর গঠন করা জাতিটির ওপর। শুধু আরব দেশটাকে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার অধীনে আনা হোয়েছে; বাকি পৃথিবী মানুষের তৈরি আইনের অধীনে চোলছে। **রসুলাল্লাহর নিজ হাতে গড়া জাতিটি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি কোরেছিলেন যে উম্মতে মোহাম্মদীর অস্তিত্বের অর্থই হোলো তাদের নেতা বিশ্বনবীর সুন্নাহ অনুসরণ করা**। তারা তাদের এই দায়িত্ব সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন যে নেতার দুনিয়া থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি-ঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, পরিবার-পরিজন, এক কথায় পার্থিব সব কিছু কোরবান করে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ কোরতে তাদের স্বদেশ আরব থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। জেহাদ ছেড়ে দেবার পর নবীর সুন্নাহর বিকল্প হিসাবে নেয়া হোলো তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস-অনভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি যে গুলোর সাথে তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের কোন সম্বন্ধই নেই; যেগুলো নেহায়েৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, জেহাদ ত্যাগকারীদের কাছে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবীর সুন্নাহ হোয়ে দাঁড়ালো, তাঁর বিপ্লব নয়, তাঁর মেসওয়াক করা, খাবার আগে জিহবায় একটু নিমক দেওয়া, খাবার পর একটু মিষ্টি খাওয়া, ডান পাশে শোয়ার মত ছোট-খাট অসংখ্য তুচ্ছ ব্যাপার। **মানুষের ইতিহাসে কোন জাতি তার নেতার এমন অপমানকর অবমূল্যায়ন কোরেছে বোলে আমাদের জানা নেই।**

ঘৃণ্য পরাজয় ও দাসত্বের সূচনাঃ শিক্ষাব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র

আল্লাহ সুরা তওবায় ৩৮ এবং ৩৯ নং আয়াতে এই জাতিকে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছেড়ে দেবার পরিণতি সম্বন্ধে এই বোলে সাবধান কোরে দিয়েছেন- "যদি তোমরা সামরিক অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কোন জাতিকে প্রতিষ্ঠা কোরবেন" অর্থাৎ তোমাদের অন্য কোন জাতির দাস, গোলাম বানিয়ে দেবেন। এই কঠোর সতর্কবাণী সত্ত্বেও আকিদা অর্থাৎ জাতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক সম্যক ধারণার *(Comprehensive Conception)* বিকৃতিতে এই জাতি জেহাদ ছেড়ে দিয়ে নফসের সাথে নিরাপদ জেহাদ শুরু কোরল। আল্লাহও তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছুদিন পরই ইউরোপের খ্রিস্টান জাতিগুলিকে দিয়ে ঐ জাতিকে সামরিকভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত কোরে শাসনভার ও কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিলেন। ঐ জাতিকে দাসে পরিণত করার পর খ্রিস্টান প্রভুরা (পূর্বেই বোলেছি, এরা কিন্তু জাতিতে খ্রিস্টান দাবি কোরলেও ঈসা আ. এর প্রকৃত অনুসারী ছিলো না।) তাদের উপরে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে নিজেদের তৈরি করা জীবনব্যবস্থা চাপিয়ে দিল। কোন জাতি যদি আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার বদলে অন্য কোন জীবনব্যবস্থা মেনে নেয়,

তখন তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে আর মো'মেন মোসলেম থাকে না, কাফের ও মোশরেক হোয়ে যায়। **এই জাতিও কার্যতঃ কাফের ও মোশরেক হোয়ে গেল।** ভবিষ্যতে এই জাতিটি যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য খ্রিস্টান শাসকরা কিছু সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কোরল। তার একটি হোচ্ছে– তারা তাদের অধিকৃত মোসলেম দেশগুলিতে পাশাপাশি দু'টি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন কোরল। একটি সাধারণ শিক্ষা এবং অপরটি মাদ্রাসা শিক্ষা। বৃহৎ মোসলেম জনগোষ্ঠীকে শাসকরা তাদের পছন্দমত একটি এসলাম শিক্ষা দেবার জন্য তাদের অধিকৃত সমস্ত মোসলেম দুনিয়ায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরল। **এই মাদ্রাসায় "এসলাম" শিক্ষা দেবার জন্য খ্রিস্টান পণ্ডিতরা বহু গবেষণা কোরে একটি নুতন "এসলাম" দাঁড় করালেন, যে "এসলামের" বাহ্যিক দৃশ্য এসলামের মতই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটার আকিদা এবং চলার পথ আল্লাহর রসুলের এসলামের ঠিক বিপরীত।** এই সিলেবাসে নামাজ, রোজা, বিয়ে-শাদী, বিবি তালাক, দাড়ি-টুপি, পাজামা, পাগড়ী, মেসওয়াক, কুলুখ, ওজু গোসল, হায়েয-নেফাস ইত্যাদি হাজার রকমের বিষয়গুলিকে এসলামের অতি জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোলে উপরে স্থান দেয়া হোল। পক্ষান্তরে তওহীদকে ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত করা হোলো এবং তওহীদের ঠিক পরেই যে জেহাদের স্থান সেই জেহাদকে অতি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত কোরে প্রায় বাদ দেওয়া হোল। এই শিক্ষাব্যবস্থায় অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোন কিছুই রাখা হোলো না, যেন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার কোরে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রি কোরে রোজগার করা ছাড়া আর কোন পথ না থাকে এবং যেন তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত এসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হোয়ে যায়;

অপরদিকে ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাটি তারা চালু কোরল স্কুল কলেজের মাধ্যমে। **এ ভাগটা তারা কোরল তাদের এই বিরাট এলাকা শাসন কোরতে যে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কেরাণী প্রয়োজন সেই কেরাণীর কাজ করার উপযুক্ত জনশক্তি তৈরি কোরতে।** তারা এতে ইংরেজি ভাষা, সুদভিত্তিক অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, ভূগোল, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখলো; সেখানে আল্লাহ, রসুল, আখেরাত ও দীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হোলো না। তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হোলো যাতে তাদের মন শাসকদের প্রতি হীনমন্যতায় আপ্লুত থাকে এবং পাশাপাশি তাদের মন-মগজে আল্লাহ, রসুল, দীন সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষ *(A hostile attitude)* সৃষ্টি হয়। আজ আমাদের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালিত হোচ্ছে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের তৈরি করা নানা রকম তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে আর ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হোচ্ছে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের তৈরি করা বিকৃত "এসলাম" দিয়ে, আল্লাহ রসুলের এসলাম দিয়ে নয়। **ভাবতে অবাক লাগে এর পরও আমরা নিজেদের মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে বিশ্বাস কোরি এবং পরকালে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের আশা কোরি।**

মোসলেম বোলে পরিচিত
জনসংখ্যার বর্তমান অবস্থা

আল্লাহ কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে এবং সুরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে মো'মেনদের এই পৃথিবীর আধিপত্য ও কর্তৃত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে যতদিন ঐ জাতি, জাতি হিসাবে অন্যায় অবিচার নির্মূল কোরে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে গেছে ততদিন আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা কোরেছেন- অর্ধেক পৃথিবীতে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল এবং ঐ জাতি যদি তখন জেহাদ ত্যাগ না কোরত তবে অবশ্যই আল্লাহ বাকি অর্ধেকও তাদের হাতে তুলে দিতেন। আল্লাহর ঐ প্রতিশ্রুতির মধ্য থেকে আরেকটি সত্য ফুটে ওঠে- সেটা হোলো এই যে, আমরা নিজেদের মো'মেন অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাসী বোলে দাবি কোরি। তাহোলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর কর্তৃত্ব, আধিপত্য আমাদের হাতে নেই কেন? তাহোলে সেই সর্বশক্তিমান কি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা কোরতে অসমর্থ (নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক)? **এর একমাত্র জবাব হোচ্ছে- আমরা যতই নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, যতই হাজার রকম এবাদত কোরি, যতই মোত্তাকী হই, আমরা মো'মেন নই, মোসলেম নই, উম্মতে মোহাম্মদী হবার তো প্রশ্নই ওঠে না।** মো'মেন হোলে (ইন্ কুনতুম্ মো'মেনীন) যে পৃথিবীর ওপর আধিপত্যের অঙ্গীকার আল্লাহ কোরেছেন, সেই পৃথিবীতে আজ আমাদের অবস্থা কী? আমাদের অবস্থা হোচ্ছে: (ক) পৃথিবীতে যে কয়টি প্রধান জাতি আছে তার মধ্যে আমরা নিকৃষ্টতম। (খ) আমাদের ছাড়া আর যে কয়টি জাতি আছে তারা সকলেই পৃথিবীর সর্বত্রই আমাদের অপমানিত, অপদস্থ, কোরছে, আমাদের আক্রমণ কোরে হত্যা কোরছে, আমাদের ধন-সম্পদ লুটে নিচ্ছে, আমাদের বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মা, মেয়ে, বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার কোরে সতিত্ব নষ্ট কোরছে। অভিশপ্ত অর্থাৎ মালাউন হবার সব লক্ষণ আজ এই জাতির গায়ে লেখা। যেখানে মানবজাতিকে অন্যায়, অশান্তি থেকে মুক্তি দেওয়াই হোলো মানুষের প্রকৃত এবাদত সেখানে সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে চরম অশান্তির মধ্যে রেখে মসজিদের চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে যেকেরে মশগুল থেকে অর্থাৎ সারা শরীরে আল্লাহর অভিশাপের ছাপ নিয়ে যে নামাজ রোজা এবং আরও হাজার রকমের এবাদত করা হোচ্ছে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হোচ্ছে মনে কোরে আমরা আহাম্মকের স্বর্গে বাস কোরছি। মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে পরিচিত এই জাতিটি আকিদার বিকৃতিতে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দেখানো দিক নির্দেশনা, হেদায়াতের ঠিক বিপরীত দিকে চলার ফলে আল্লাহর চোখে এরা আর মো'মেনও নেই, মোসলেমও নেই, উম্মতে মোহাম্মদীও নেই।

[পাঠক মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ: ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৭৮২১৮৮২৩৭, ০১৫৫৯৩৫৮৬৪৭, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩]

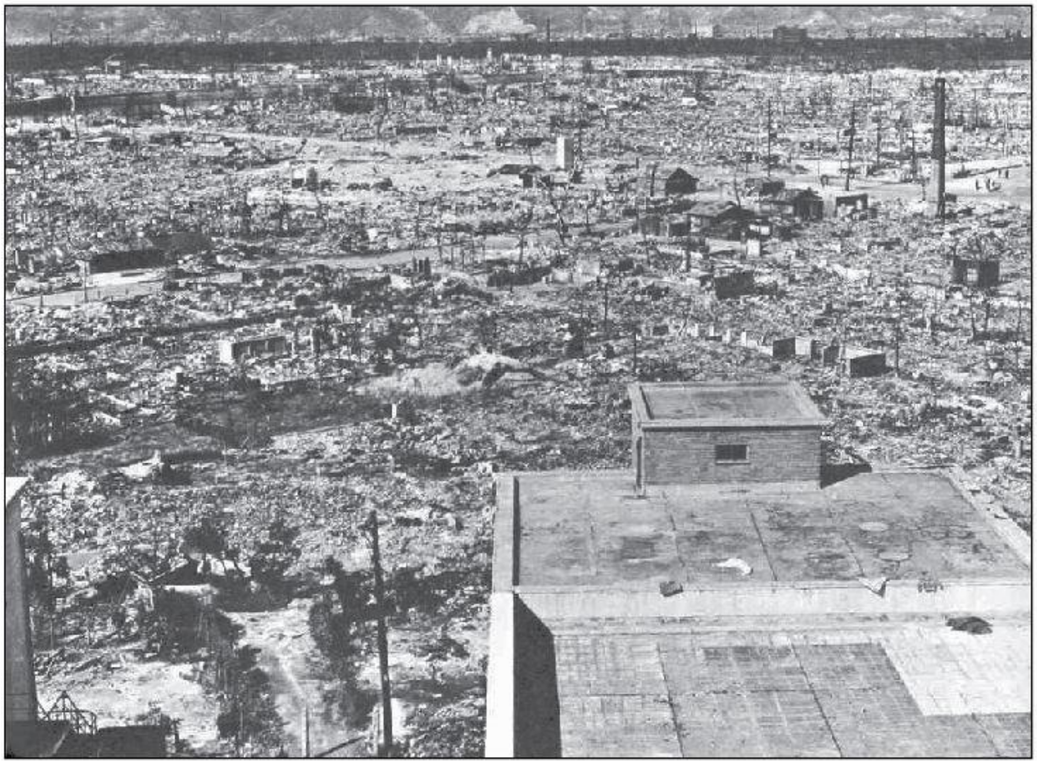

হিরোশিমা-নাগাসাকির ধ্বংসলীলা

শতদল বড়ুয়া

সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষ বাঁচার জন্যে নানা কৌশল উদ্ভাবন করেছে। একে অপরকে ঘায়েল করার জন্যে, শত্রুর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্যে এবং রাষ্ট্র তথা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার খাতিরে প্রয়োজনীয় নানা জিনিসপত্র আবিষ্কার অব্যাহত রয়েছে। যুদ্ধের নেশাটা প্রাচীনকালের মতো বর্তমানেও সচল রয়েছে। বর্তমানের যুদ্ধ বিরাট, ব্যাপক এবং খুবই জটিল। প্রচীনকালে যুদ্ধাস্ত্র ছিল তীর, ধনুক, বর্শা ইত্যাদি। বর্তমানের যুদ্ধাস্ত্র পারমাণবিক বোমা, হায়ড্রোজেন বোমাসহ উন্নত প্রযুক্তির নাম না জানা মারণাস্ত্র।

৬৯ বছর পূর্বে এশিয়ার উন্নত দেশ জাপানে যুক্তরাষ্ট্র এক চরম মানবতাবিরোধী বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট, রোজকার মতো জাপানিরা দিনের কর্মকাণ্ডে ছুটছে আপন গতিতে। জীবিকার তাগিদে ছুটে চলা পথে তাদের তাড়া করছে মৃত্যু দূত, একথা কেউ জানত না, জানার কথাও নয়। প্রাণ চাঞ্চল্যের শহর "হিরোশিমা" ও "নাগাসাকি"। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালোনা গাই বি-২৯ বোমারু বিমান থেকে হিরোশিমা শহরে আনবিক বোমা (অ্যাটম বোমা) ফেলা হয়। একই মাসের ৯ আগস্ট মার্কিন যুদ্ধ বিমান থেকে নাগাসাকিতে ফ্যাটম্যান নামে আরেকটি আনবিক বোমা ফেলা হয়। দ্বিতীয় বোমাটি ফেলার নির্দিষ্ট টার্গেট ছিল জাপানের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় দীপ কিয়ুসুর কোকুয়া অস্ত্রাগারে। বৈরী আবহাওয়ার কারণে বৈমানিক ভুলবশতঃ বোমাটি নাগাসাকি শহরে ফেলেন। (সূত্রঃ প্রথম আলো /০৬, ৬ আগস্ট)।

হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে দুইদিনের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে যে বর্বর নারকীয়তার জন্ম দেয় তার অনলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর মিছিলে সামিল হয়েছিল প্রায় ১,৪০,০০০ হাজার লোক। আহতের সংখ্যা! সে-তো আরো পীড়াদায়ক। তখন দুই শহরের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল বাঁচার আর্তনাদ। লক্ষ লক্ষ আহতদের বাঁচানোর জন্যে বিশ্ববাসী এগিয়ে যাওয়ার তথা দুঃখ প্রকাশ করারও ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল। মানবসভ্যতা যেন হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ায় এখানে। এ বর্বর হত্যাকাণ্ডের পেছনের ঘটনা হলো ১৯৩৯ সাল। পৃথিবীতে তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় নি। তবে তৎকালীন জার্মানির এডলফ হিটলারের গলাবাজিতে সারাবিশ্ব আশঙ্কা করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। পশ্চিমা বিশ্ব হিটলারের আণবিক বোমা প্রাপ্তির একচেটিয়া অধিকারী হয়ে সারাবিশ্বের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার গোপন খবরে তটস্থ হয়ে পড়ে। ঠিক এমন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী হিসেবে বসবাসকারী, হাঙ্গেরিতে জন্মগ্রহণকারী বিজ্ঞানী ড. লিও জিলার্ড সর্বপ্রথম আণবিক বোমা তৈরির জন্যে একটি প্রস্তাব দেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টকে।

১৯৪০ সালের ৭ মার্চ আইনস্টাইন তাঁর এক চিঠিতে আণবিক বোমা তৈরির জন্যে প্রেসিডেন্টের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘটলো আরেক অঘটন ১৯৪৭ সালের ৭ ডিসেম্বর। জাপান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার বিমান এবং নৌঘাঁটিতে সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে দেয়। চোখের পলকে যেখানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এবার যুক্তরাষ্ট্র জাপানের উপর আঘাত হানার পরিকল্পনা আঁটলো। সুদে-আসলে বদলা নেয়ার জন্যে কৌশল অবলম্বন করতে থাকলো। যুক্তরাষ্ট্র

আগের দুই বৈজ্ঞানিকের আণবিক বোমা বানানোর প্রস্তাব বিবেচনায় এনে চূড়ান্তভাবে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৫ সালের ৮ মে জার্মানির আত্মসমর্পণের পর ইউরোপের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলেও অপর অক্ষশক্তি জাপান তখনও মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেনি। এতে তখন এটাই প্রতীয়মান হয়েছিল যে- যুক্তরাষ্ট্র যেই আণবিক বোমা তৈরি করেছে তার লক্ষ্যবস্তু জাপান।

জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকি শহরে বোমা হামলা ছিল কোন যুদ্ধে আণবিক বোমা হামলার প্রথম ঘটনা। ৬ ও ৯ আগস্টের সেই ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে এতই মানবতাবিরোধী যার ক্ষয়ক্ষতি এখনো বহমান। জাপানের ঐতিহাসিক এই দুই শহরের মানুষ শিখছে নতুনভাবে বাঁচার উপায়। অসহায় মানুষের কান্না এবং আহাজারী বিশ্বের মানুষকে শিখিয়েছে যুদ্ধ এবং আধুনিক ধরনের অস্ত্রকে ঘৃণা করতে। হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ: বোমার নাম "লিটল বয়" নিক্ষেপের সময় ৬ আগস্ট, ১৯৪৫, সময়-৮টা ১৫ মিনিট (জাপানের সময় অনুযায়ী), বোমা বহনকারী বিমানের নাম-বি-২৯, যুদ্ধ বিমান। নিহত ৬৬ হাজার (তাৎক্ষণিক), বোমার শক্তি-১৫.০২ কিলোটন টিএনটির সমান, আহত- ৭০ হাজার (তাৎক্ষণিক), ক্ষতিগ্রস্ত চতুর্পাশ-বোমা নিক্ষেপের কেন্দ্র থেকে চারিদিকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত। মোট আহত-১ লক্ষ ৩৬ হাজার। হিরোশিমায় হিসেব মতে- ১৯৪৫ সালের শেষ নাগাদ মৃতের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজারের মতো।

নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার ক্ষয়ক্ষতি নিম্নরূপ: বোমার নাম- ফ্যাটম্যান, নিহতের সংখ্যা- ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন (তাৎক্ষণিক), আহত- ৭৪ হাজার ৭৯৩ জন (তাৎক্ষণিক), বোমা বহনকারী বিমানের নাম-বি-২৯ যুদ্ধ বিমান, বোমা নিক্ষেপের সময়- ৯ আগস্ট, ১৯৪৫ সাল, স্থানীয় সময় রাত ৩টা ৪৭ মিনিট, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা-৬.৭ মিলিয়ন বর্গমিটার, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি-সম্পূর্ণ ধ্বংস ১১ হাজার ৫৭৪টি ধ্বংসপ্রাপ্ত ১ হাজার ৩২৬টি, মারাত্মক ভস্মীভূত ৫ হাজার ৫০৯টি, মোট ১৮ হাজার ৪০৯টি।

মারাত্মক এ বোমার বিষক্রিয়ার পরবর্তীতে শহরে ২ লাখ ৭০ হাজার জনসংখ্যার দেড় লাখেরও বেশি লোক নিহত হয়েছিল। পঙ্গুত্ব বরণ করেছে অসংখ্য জনসাধারণ। বধ্যভূমিতে পরিণত হওয়া দুই শহরের অধিবাসীরা বেশুমার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে।

হিরোশিমা নাগাসাকিতে এই বর্বর হামলার পর জাপানিদের মনোবল ভেঙে পড়ে। জাপানের সম্রাট হিরোহিতো আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করে ১৪ আগস্ট। এত বছর পরও জাপানিরা স্বজন হারোনোর ব্যথা ভুলতে পারে নি। হিরোশিমা দিবস পালন উপলক্ষে তারা সমবেত হন দক্ষিণ-পশ্চিমের কান্ট্রি ক্লাবে ড্রাইভের আর্টস পার্ক ও ৪৫ নম্বর স্ট্রিটে ৭ আগস্ট। প্রিয়জনের আত্মার পারলৌকিক সদগতি কামনায় আয়োজন করেন প্রার্থনা সভা। বিহারে গিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিহতদের স্মরণ করেন। গেয়ে থাকেন বেদনাতুর গান, করেন কবিতা পাঠ।

তেজষ্ক্রিয়তার কুফল জাপানিরা এখনও ভোগ করছে। শহর দু'টি এখনো বহন করছে আত্মাহীন যান্ত্রিক 'সভ্যতা'র পুরোধা যুক্তরাষ্ট্রের পাপের বোঝা।

একনজরে ঘটনাপঞ্জি:

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮: নাজি জার্মানির দুই বিজ্ঞানী অটো হার্ন এবং ফ্রিৎজ স্ট্রাসমান সফলভাবে অণু ভাঙার পর সে দেশে আণবিক অস্ত্র কর্মসূচি শুরু হয়।

২ আগস্ট, ১৯৩৯: আলবার্ট আইনস্টাইন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টকে জার্মানের সম্ভাব্য পরামাণু বোমা হামলা সম্পর্কে সতর্ক করে দেন এবং আণবিক গবেষণায় জোর দেয়ার দাবি জানান।

জুন, ১৯৪২: এনরিকো ফেরমির নেতৃত্বে মার্কিন বিজ্ঞানীরা বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমা অস্ত্র কর্মসূচি শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র।

১৬ জুলাই, ১৯৪৫: যুক্তরাষ্ট্র নিউ ম্যাক্সিকোর আলামোগোরডো এলাকার কাছে পরমাণু পরীক্ষা চালায়। এটি ছিল বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা।

২৬ জুলাই, ১৯৪৫: মিত্রশক্তি জাপানের প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে এবং বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করার দাবি জানায়। প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান সেভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিনের কাছে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আণবিক বোমা রয়েছে।

৬ আগস্ট, ১৯৪৫: হিরোশিমায় প্রথমবারের মতো আণবিক বোমা নিক্ষেপ।

৯ আগস্ট, ১৯৪৫: নাগাসাকিতে দ্বিতীয়বারের মতো আণবিক বোমা নিক্ষেপ।

১৫ আগস্ট, ১৯৪৫: সম্রাট হিরোহিতো রেডিও ভাষণে জাপানের আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেন।

[লেখক: বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট]

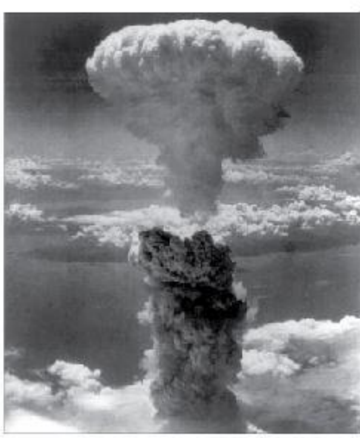

আণবিক বোমার ভয়াবহ চিহ্ন। এই ভয়ঙ্কর পরিণতি আবারও ঘোটে যেতে পারে বিশ্বময় যে কোন মুহূর্তে।

১ ও ২ নং ছবিতে দেখানো হোয়েছে কিভাবে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার কোরে বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করানো হয় আর ৩ নং ছবিতে একটি ঘোড়ায় চড়া একচোখ কানা একটি কাল্পনিক দানবের ছবি দেওয়া হোয়েছে। রসুলাল্লাহ বোলেছেন, দাজ্জালের আদেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। [নাওয়াস বিন সা'মান (রাঃ) থেকে- মোসলেম, তিরমিযি] রসুলাল্লাহর এই হাদিসটি কি পাশ্চাত্য ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায় না? নাকি এখনও একচক্ষু বিশিষ্ট ঘোড়ায় উপবিষ্ট দানবের অপেক্ষা কোরবেন?

দাজ্জাল শারীরিক দানব নয়

এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

চৌদ্দশ' বছর থেকে মোসলেম উম্মাহর ঘরে ঘরে দাজ্জাল সম্বন্ধে আলোচনা চোলে আসছে। আল্লাহর শেষ রসুল মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেসব কথা বোলে গেছেন, পৃথিবীতে কি কি ঘটনা ঘোটবে সেগুলি সম্বন্ধে আভাস ও সরাসরি যা জানিয়ে দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে দাজ্জাল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বিগ্নকর। উদ্বিগ্নকর ও ভীতিপ্রদ এই জন্য যে দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি সমগ্র মানবজাতির উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার কোরে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেবে, সমস্ত মানবজাতিকে বিপথে চালাবার চেষ্টা কোরবে। শুধু চেষ্টা নয়, বেশ কিছু সময়ের জন্য দাজ্জাল তার শক্তি ও প্রভাব বিস্তার কোরে গোটা মানবজাতিকেই বিপথে পরিচালিত কোরবে। কাজেই দাজ্জালকে কোনভাবেই ছোট কোরে দেখার বা অবজ্ঞা করার উপায় নেই।

আল্লাহর রসুল বোলেছেন– আদমের সৃষ্টি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এমন কোন বিষয় বা ঘটনা হবে না, যা দাজ্জালের চেয়ে গুরুতর ও সংকটজনক (এমরান বিন হোসায়েন (রাঃ) থেকে মোসলেম)। তিনি এ কথাও বোলেছেন যে- নুহ (আঃ) থেকে নিয়ে কোন নবীই বাদ যান নি যিনি তাঁর উম্মাহকে দাজ্জাল সম্বন্ধে সতর্ক করেন নি (আবু ওবায়দা বিন যাররাহ (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে আবু দাউদ, বোখারী, মোসলেম ও তিরমিযি)। শুধু তাই নয়, আল্লাহর নবী নিজে দাজ্জালের সংকট (ফেত্না) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন (আয়েশা (রাঃ) থেকে বোখারী)।

যে ব্যাপারটা মানবজাতির সৃষ্টি থেকে নিয়ে ধ্বংস পর্যন্ত যা কিছু ঘোটবে সে সমস্ত কিছুর চেয়ে বড়, সেটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আর আমরা সে সম্বন্ধে কতটুকু সজাগ ও সচেতন? বাস্তব অবস্থা এই যে আমরা মোটেই সজাগ নই এবং দাজ্জাল সম্বন্ধে আমাদের কোন মাথাব্যথাই নেই। যে ঘটনাটিকে আখেরী নবী আদম (আঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুতর ও সাংঘাতিক ঘটনা বোলে চিহ্নিত কোরেছেন সেই মহা-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমাদের সমাজের আলেম সাহেবরাও কোনও গভীর গবেষণা করেন নি। এই মহা-প্রয়োজনীয় ব্যাপারটাকে বুঝার জন্য যতটুকু শ্রম দিয়েছেন তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি শ্রম ও সময় দিয়েছেন দাড়ি-মোছ, টুপি-পাগড়ী, পাজামা, মেসওয়াক, কুলুখ আর বিবি তালাকের মত তুচ্ছ ফতোয়ার বিশ্লেষণে।

দাজ্জাল সম্বন্ধে মহানবীর হাদিসগুলি প্রধানত দুই রকমের। একটা ভাগ দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের ব্যাপারে, অন্যটি দাজ্জালের পরিচয়জ্ঞাপক। মানবজাতির জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সর্ববৃহৎ বিপদের সম্বন্ধে মানুষ বেখেয়াল ও নিরুদ্বেগ। যারা ধর্মের ব্যাপারে মহা-আলেম হোয়েছেন ও ধর্মচর্চার মধ্যে ডুবে আছেন তারাও সংকীর্ণ ও প্রায়ান্ধ দৃষ্টির জন্য দেখতে ও বুঝতে সক্ষম হন নি যে, দাজ্জালের আবির্ভাব মানবজাতি ধ্বংসকারী নুহের (আঃ) মহাপ্লাবনের চেয়েও, প্রলয়ঙ্করী বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও কেন বড় (আকবর) ঘটনা; কেন মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের (যদি সে ঘটনা সত্য হোয়ে থাকে) চেয়েও সাংঘাতিক, যে যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী অর্থাৎ প্রায় এক কোটি আদম সন্তান নিহত হোয়েছিলো। অন্য ভাগের হাদিসগুলিতে আল্লাহর শেষ রসুল মানবজাতি যেন

দাজ্জালকে ঠিকভাবে চিনতে পারে ও সাবধান হয়, দাজ্জালকে প্রত্যাখ্যান করে, তার বিরোধিতা করে, সে জন্য তার পরিচিতির চিহ্নগুলি বোলেছেন। কিন্তু তার সময়ের মানুষের শিক্ষার স্বল্পতার জন্য তাঁকে বাধ্য হোয়ে দাজ্জালকে রূপকভাবে বর্ণনা কোরতে হোয়েছে। কিন্তু সে রূপক বর্ণনা আজ পরিষ্কারভাবে ধরা দিয়েছে, যদিও আমাদের প্রায়ান্ধ দৃষ্টির জন্য সে বর্ণনাও আমরা বুঝতে সক্ষম হোচ্ছি না, দাজ্জালকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েও দাজ্জালের পায়ে সাজদায় পড়ে থেকেও বুঝতে পারছি না, যে এই সেই বিশ্বনবী বর্ণিত দাজ্জাল, মাসীহ উল কাযযাব।

প্রথমেই দাজ্জালের নামটাকে নেয়া যাক। আল্লাহর রসুল একে দাজ্জাল নামে অভিহিত কোরেছেন। কিন্তু এটা কোন নাম নয়, এটা একটা বর্ণনা, অর্থাৎ বিষয়টার বর্ণনা। যেমন এমাম মাহ্দী কোন নাম নয়- বর্ণনা। মাহ্দী অর্থ হেদায়াহ প্রাপ্ত, যিনি সঠিক পথ, হেদায়াহ পেয়েছেন, তাঁর নিজের অন্য নাম থাকবে সবার মত। তেমনি দাজ্জাল শব্দের অর্থ চাকচিক্যময় প্রতারক, যেটা বাইরে থেকে দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু ভেতরে কুৎসিত। যেমন মাকাল ফল, দেখতে অতি সুন্দর, মনে হবে খেতেও অতি সুস্বাদু, কিন্তু আসলে খেতে বিস্বাদ, তিক্ত। 'দাজ্জাল' কোন দৈত্য-দানব নয়, 'দাজ্জাল' ইহুদি-খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা'। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতা বাইরে থেকে দেখতে চাকচিক্যময়, এর প্রযুক্তিগত সাফল্য মানুষকে মুগ্ধ কোরে ফেলে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু এর প্রভাবাধীন পৃথিবী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবিচারে, দুঃখে, ক্রন্দনে, অশ্রুতে ভরপুর। বিগত শতাব্দীতে এই 'সভ্যতা' দুইটি বিশ্বযুদ্ধ কোরে চৌদ্দ কোটি আদম সন্তান হতাহত কোরেছে এবং তারপর থেকে বিভিন্ন ছোট খাটো যুদ্ধে আরও দুই কোটি মানুষ হত্যা কোরেছে। আহত বিকলাঙ্গের সংখ্যা ঐ মোট সংখ্যার বহুগুণ। বিধবা, সন্তানহারা, গৃহহারা, দেশত্যাগীদের কোন হিসাব নেই। আর এই নতুন শতাব্দীতে শুধু এক ইরাকেই হত্যা কোরেছে দশ লক্ষ মানব। ইরাক ছাড়াও আফগানিস্তানসহ আরও অনেকগুলো দেশে তার এই হত্যাযজ্ঞ আজও চোলছে। এই 'সভ্যতা'র অধীনস্থ সমস্ত পৃথিবীতে খুন, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, ধর্ষণ, অত্যাচার সীমাহীন এবং প্রতিদিন প্রতি দেশে ধাঁ ধাঁ কোরে বেড়ে চোলেছে। তাই এর নাম দাজ্জাল, চাকচিক্যময়, চোখ ধাঁধানো প্রতারক।

আল্লাহর রসুল কর্তৃক বর্ণিত আখেরী যামানার দাজ্জাল কোন দৃশ্যমান *(Visible)* বা শরীরী *(Physical)* দানব নয়, তখনকার দিনের মানুষদের বুঝাবার জন্য এটি একটি রূপক *(Allegorical)* বর্ণনা। এর পরও যদি কেউ জোর কোরে বোলতে চান যে, না, এক চক্ষুবিশিষ্ট, বিরাটকায়, জ্বলজ্যান্ত একটি অশ্বারোহী দানবই আসবে, তাহোলে আমার বক্তব্য হোচ্ছে, ধরুন আপনার কথামত এক চক্ষুবিশিষ্ট এক বিশাল দানব পৃথিবীতে উপস্থিত হোল, তার বাহন ঘোড়া বা গাধার দুই কানের ব্যবধানই সত্তর অর্থাৎ বহু সহস্র হাত [আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে- বায়হাকী, মেশকাত], তাহোলে কি কারো মনে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে যে এটাই রসুল বর্ণিত সেই দাজ্জাল? **চোখের সামনে প্রায় পৃথিবীর সমান আয়তনের এক দানবকে দেখে প্রথমেই সকলের মনে প্রশ্ন আসবে, এই বিরাট দানব আসলো কোত্থেকে! তাকে দেখে কেবল মোসলেমরাই নয়, অ-মোসলেমরাও এক মুহূর্তে চিনে ফেলবে যে, এই তো এসলামের নবীর বর্ণিত দানব দাজ্জাল। সকল মানুষেরই তখন আমাদের নবীর উপর এবং এসলামের উপর ঈমান এসে যাবে।**

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর রসুল বোলেছেন, দাজ্জাল ইহুদি জাতি থেকে উদ্ভূত হবে এবং আমার উম্মতের সত্তর হাজার (অসংখ্য) লোক দাজ্জালের অনুসরণ কোরবে [ইবনে হানবাল (রাঃ) থেকে মোসলেম]।

দাজ্জাল যদি রসুলের বর্ণনা অনুযায়ী সত্যিই জ্যান্ত কোন দানবীয় প্রাণী হয় তাহোলে কি কোরে এমন দানব মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ইহুদি জাতির মধ্য থেকে আসতে পারে? আর মোসলেমরাই কি কোরে আল্লাহকে ছেড়ে একটি দানবকে অনুসরণ কোরতে পারে?

তৃতীয়ত, আল্লাহর রসুল বোলেছেন, দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে (অর্থাৎ কপালে) কাফের লেখা থাকবে। শুধু মো'মেন, বিশ্বাসীরাই তা দেখতে এবং পড়তে পারবে; যারা মো'মেন নয়, তারা পড়তে পারবে না [আবু হোরায়রা (রাঃ), আবু হোযায়ফা (রাঃ) এবং আনাস (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম]।

অর্থাৎ কিছু লোক (মো'মেন) দাজ্জালকে কাফের বোলে বুঝতে পারবে আর কিছু লোক (যারা মোমেন নয়) দাজ্জাল যে কাফের তা বুঝতে পারবে না, এবং বুঝতে পারবে না বোলেই বহু সংখ্যক লোক তাকে রব বোলে মেনে নেবে। দাজ্জাল যদি শরীরী কোন দানবই হয় তাহোলে সবাই তাকে প্রথম দর্শনেই দাজ্জাল বোলে চেনার কথা। তারপরও সে কাফের কি কাফের নয় এ নিয়ে মানুষের মধ্যে দ্বিমত হওয়া সম্ভব? ধরুন কোন লোকালয়ে বা জনবহুল স্থানে হঠাৎ একটি বাঘ এসে পড়লো; সেখানের অবস্থাটা কি হবে ভাবুন। ছেলে, বুড়ো, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সবাই প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পারবে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা কোরবে, তাই নয় কি? অথচ অকল্পনীয় বিরাট, ভয়ঙ্কর একটি দানব, যার বাহনের এক পা পৃথিবীর এক প্রান্তে আরেক পা পৃথিবীর অপর প্রান্তে, তাকে সামনা সামনি দেখেও কেউ চিনবে- কেউ চিনবে না, কেউ তাকে অনুসরণ কোরবে- কেউ কোরবে না, কেউ তার কপালের কাফের লেখা পড়তে পারবে- কেউ পারবে না এ কি হোতে পারে?

তাহোলে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে দাজ্জাল কোন শরীরী বা বস্তুগত দানব নয়, এটি একটি বিরাট দানবীয় শক্তির রূপক বর্ণনা; সেই সাথে এ কথাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে ঐ বিরাট শক্তিটিই হোচ্ছে বর্তমান দুনিয়ার ইহুদি খ্রিস্টান বস্তুবাদী যান্ত্রিক 'সভ্যতা'। (Judeo-Christian Materialistic Civilization)

[সমস্ত পৃথিবীময় অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ ও রক্তপাত ইত্যাদি নির্মূল করে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সনে এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী হেযবুত তওহীদ নামক আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ তাঁকে প্রকৃত এসলামের যে জ্ঞান দান কোরেছেন তা তিনি যতটা সম্ভব হোয়েছে বই-পুস্তক লিখে, বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচারের চেষ্টা কোরেছেন। এই লেখাটি মাননীয় এমামুযযামানের লেখা "দাজ্জাল? ইহুদী-খৃস্টান সভ্যতা!" বইটি থেকে সম্পাদিত। দাজ্জালের মতো এত ব্যাপক একটি বিষয় এইটুকু লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা কষ্টকর, তাই 'দাজ্জাল' সম্মন্ধে বিস্তারিত জানতে যামানার এমামের লেখা "দাজ্জাল? ইহুদী-খৃস্টান সভ্যতা!" বইটি পড়ুন এবং এর উপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্রটি দেখুন।]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে

সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতা

শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপিত, আলোচিত, গৃহীত সিদ্ধান্ত

——ঐক্যের পথে সকল ধর্ম

সমস্ত মানবজাতি একই পিতা-মাতা আদম হাওয়ার সন্তান। আমরা এক পরিবার, প্রত্যেকে ভাই-বোন। যুগে যুগে মানবজাতির শান্তির জন্য স্রষ্টা, আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রসুল-অবতারদের মাধ্যমে জীবনবিধান বা ধর্ম এসেছে। সেগুলিকে পরবর্তীকালে ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এক ধর্মের অনুসারীদেরকে তারা অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে অশ্রদ্ধার জন্ম দিয়েছে। তাদের কাজের ফলে মানবজাতির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে হাজার প্রকার বিভক্তি, ফেরকাবাজি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। মানবজাতি আজ যার যার ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে সরে গিয়ে পাশ্চাত্য 'সভ্যতা'র চাপিয়ে দেওয়া বস্তুবাদী, স্রষ্টাহীন জীবনব্যবস্থার অনুসরণ করে নিজেদের মধ্যে হানাহানি, রক্তারক্তিতে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। এ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে আমাদেরকে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। সকল প্রকার সন্ত্রাস, হানাহানি, ধর্মব্যবসা ও অপ-রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে, মানুষের শান্তির লক্ষ্যে কাজ করাই স্রষ্টার প্রকৃত এবাদত, উপাসনা। সমস্ত মানবজাতিকে অশান্তির মধ্যে ফেলে রেখে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডার চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে প্রার্থনায় মশগুল থাকলে স্রষ্টা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন না, পরকালেও মুক্তি মিলবে না। তবু মুক্তিসন্ধানী মানুষ এগুলিকেই ধর্মের কাজ বা এবাদত মনে করে পালন করে যাচ্ছেন, কিন্তু শান্তি আসছে না। তারা বুঝতে পারছে না যে, এগুলি কোনটাই প্রকৃত এবাদত নয়। প্রকৃত এবাদত হচ্ছে মানুষের কল্যাণার্থে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করা। মানুষকে যদি এই কথাটি বুঝানো যায় তাহলেই সমাজে শান্তি আসা সম্ভব। তখনই মানুষ একে অপরের শান্তির জন্য কাজ করবে, একে অন্যের সম্পদের নিরাপত্তা দেবে। এই এবাদতই তাকে জান্নাতে বা স্বর্গে নিয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ কোন এবাদত চান তা যদি মানুষকে বুঝানো না যায় তবে যতই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করুক আর যতই প্রার্থনা করা হোক অন্যায়, অবিচার বন্ধ হবে না। যে সমাজের মানুষ প্রত্যেকে নিজের স্বার্থচিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, স্বার্থোদ্ধারের জন্য কোন ন্যায়-অন্যায়ের পরোয়া করে না, সেখানে অন্যের অধিকার লঙ্ঘিত হবেই, অশান্তি হবেই।

এই মহাসত্যগুলি কেবলমাত্র পত্রিকায় প্রকাশ করেই হেযবুত তওহীদ ক্ষান্ত হয় নি, বাংলাদেশের শহরে, নগরে, গ্রামে, গঞ্জে, প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে পথসভা ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, বই-পুস্তিকা, হ্যান্ডবিল বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে। ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে, এর কোন বিনিময় চলে না, ধর্মের বিনিময় দিতে পারেন কেবলমাত্র আল্লাহ। আজ সকল ধর্মের ধর্ম ব্যবসায়ীরাই মানবতার প্রধান শত্রু। আজকে ধর্মের নামে যে ব্যবসা করা হচ্ছে এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, অন্যায়-অবিচার, জ্বালাও-পোড়াও করা হচ্ছে তা মোটেও আল্লাহ-রসুলের ইসলাম নয়। সারা দুনিয়ায় একদিকে চলছে ধর্মের নামে ব্যবসা আরেকদিকে চলছে রাজনীতির নামে বাণিজ্য। এই দু'টিকে কাজে লাগিয়ে পরাশক্তিগুলি যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে অস্ত্রবাণিজ্য। এদের সমন্বিত পরিণতি হচ্ছে মানবতার চূড়ান্ত ধ্বংস। সুতরাং আসুন আমাদের নিজেদের স্বার্থে আমরা যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই।

আমরা হাজার হাজার সভা সেমিনার করেছি যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ন্যায়ের পক্ষে থাকার এবং সহিংস কর্মকাণ্ডে যোগ না দেওয়ার শপথ গ্রহণ করে।

কিন্তু মানবজাতিকে এভাবে ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার মত বিরাট কাজ আমাদের একার পক্ষে করা দুরূহ। অন্যায় অবিচার, সন্ত্রাস এর বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ করার এই কাজে জাতির কর্ণধার হিসাবে সরকারের দায়িত্ব অগ্রগণ্য। তখন আমরা সরকারের কাছেও প্রস্তাবনা আকারে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরি। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকারের মন্ত্রীবর্গ, সংসদ

সদস্য, সরকারি দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও প্রশাসনের অনেক সত্যনিষ্ঠ কর্মকর্তা এগিয়ে আসেন এবং তারাও আমাদের সঙ্গে সভা-সেমিনারে অংশ নিয়ে আমাদের এই সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন, জনগণকেও এই কাজের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। আমাদের এই কাজে তারা সর্বতোভাবে সহযোগিতাও করার আশ্বাস প্রদান করেন।

বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ধর্মব্যবসায়ী জঙ্গিদেরকে দমন করতে শক্তি প্রয়োগের পথ অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু যেহেতু জঙ্গিরা মানুষকে ধর্মীয় আবেগে পরিচালিত করে, তাদেরকে জোর করে দমন করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। তাই ধর্মব্যবসায়ীদের অপতৎপরতা রোধ করতে হলে শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি আদর্শিক মোকাবেলাও অপরিহার্য। তাদের পথ যে ভুল তা প্রমাণ করার মত যথেষ্ট উপাদান আমাদের কাছে আছে, যা দিয়ে আমরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার চেষ্টাও করে যাচ্ছি। এবং এটা করে যাচ্ছি একান্তই মানবতার কল্যাণে, আমাদের কোন পার্থিব স্বার্থ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়।

এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমরা এদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করছি। আমরা এদেশে বসবাসকারী হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, মুসলিম সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও বিদ্বেষ দূর করে তাদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ধর্ম ব্যবসায়ী শ্রেণি এবং ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতিকরা নিজেদের হীন স্বার্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করে, ঘৃণা বিস্তার করে। আমরা মনে করি, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সংখ্যালঘু নির্যাতন কেবল শক্তিপ্রয়োগে নির্মূলযোগ্য নয়। কারণ এর দ্বারা হৃদয়ের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ দূর হয় না। যদি সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে এটা বোঝানো যায় যে, সকল ধর্মই একই স্রষ্টার প্রেরিত, সকল

মানুষই একই বাবা-মা আদম হাওয়ার সন্তান, সকল ধর্মগ্রন্থই পবিত্র, কাজেই নিজ ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্ম প্রবর্তককে যেমন শ্রদ্ধা, সম্মান করা হয় তেমনি অন্য ধর্মের প্রবর্তক এবং পবিত্র গ্রন্থকে সম্মান করা কর্তব্য; এই শিক্ষা যদি জাতির মধ্যে প্রবেশ করানো সম্ভব হয় তাহলেই সত্যিকার অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠন করা সম্ভব হবে। এই লক্ষ্য সামনে নিয়ে আমরা দেশজুড়ে 'সকল ধর্মের মর্মকথা-সবার উর্ধ্বে মানবতা' এই প্রতিপাদ্যের ভিত্তিতে সর্বধর্মীয় সম্মেলন করে যাচ্ছি। উক্ত সেমিনারগুলিতে প্রতিটি ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ধর্মগুরুগণ আমাদের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। বিভিন্ন ধর্মের লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের বক্তব্য শুনে আবেগাপ্লুত হয়েছেন, আমাদেরকে ভাই ও বন্ধু হিসাবে সাদরে বরণ করে নিচ্ছেন।

আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ী যে, যারা আমাদের বক্তব্য শুনে, বই পড়ে, ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখে আমাদের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন, তাদের ধর্মীয় আবেগকে আর কেউ অনৈতিক সন্ত্রাসমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। আমরা সকল ধর্মের মানুষকে আহ্বান করছি যে, আসুন কোন্ কোন্ বিষয়ে আমাদের সকল ধর্মে মিল আছে সেগুলি খুঁজে বের করি, অমিলগুলো দূরে সরিয়ে রাখি। বিভেদের রাস্তা না খুঁজে সংযোগের রাস্তা খুঁজি। এদেশে বসবাসকারী সকল ধর্মের অনুসারীদের মানবতার কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা, এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এক বাবা-মায়ের সন্তান সমগ্র মানবজাতিকে একটি পরিবারে পরিণত করার লক্ষ্যে সারাজীবন কাজ করে গেছেন। আমরা তাঁর অনুসারীরা সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের জীবন-সম্পদ সবকিছু উৎসর্গ করে সংগ্রাম করে যাচ্ছি।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী: শনিবার সকাল ১০ ঘটিকায়, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট হল সেমিনার কক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় "সকল ধর্মের মর্মকথা - সবার উর্ধ্বে মানবতা" শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এম.পি। বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারি মাহবুবুল হক শাকিল, নুরুল ইসলাম সুজন এম.পি.; শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল এম.পি; শাহজাহান কামাল এম.পি, মিসেস শাহানা রব্বানী এম.পি, সাবেক এম. পি তানভীর শাকিল জয় প্রমুখ। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট এর সেক্রেটারি জেনারেল জয়েন্ট এবং বাংলাদেশ হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ এর সেক্রেটারি নির্মল রোজারিও, প্যাস্টর রবিনসন মণ্ডল (গোপালগঞ্জ), আনন্দমার্গ প্রচার সংঘের সভাপতি

আচার্য্য সুজিতানন্দ অবধূত, দেশেরপত্রের উপদেষ্টা উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর সাবেক সচিব ড. মঙ্গলচন্দ্র চন্দ , তরিকতে আহলে বায়াত এর সভাপতি আহমেদ কামরুল মোর্শেদ, বাংলাদেশ লাইব্রেরি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর সিইও মাহবুবুর রহমান, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও অতিরিক্ত সচিব এস.এস.চাকমা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সহ-সম্পাদক হাসিবুর রহমান, বাংলাদেশ ব্রাহ্ম সমাজ এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী রণবীর পাল রবি, বস্ত্রদপ্তর এর সাবেক উপ-পরিচালক এস.বি. চাকমা, দৈনিক বজ্রশক্তির প্রকাশক ও সম্পাদক এস.এম.সামসুল হুদা, শ্রী শ্রী লক্ষীকান্ত দুর্গা মন্দির, মানিকনগর এর সহ-সভাপতি শ্রী নবকুমার দাস, বেটার টুমরো সোসাইটির সেন্টার ইনচার্জ ড. হাসিনা আহমেদ, শিবশক্তি মিশন এর গণসংযোগ ও উন্নয়ন কর্মকর্তা রামানন্দ দাস প্রমুখ। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, ধর্মগুরু, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, জনপ্রতিনিধি, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ব্যাংক কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর কর্মকর্তা, প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের উপস্থিতিতে সরব হয়ে উঠেছিল ঐতিহ্যবাহী হলরুম। উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হবার পক্ষে মত দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতা শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রটি সকলের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। এবং সারা দেশব্যাপী সকল স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসাসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীসহ সর্বধর্মীয় আলোচনা সভা, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি আয়োজনের প্রস্তাবের সাথে উপস্থিত সকলে একমত হন। এক্ষেত্রে দৈনিক দেশেরপত্রের উপদেষ্টা ও হেযবুত তওহীদের আমীর মসীহ উর রহমানের উত্থাপিত প্রস্তাবনা-অবিলম্বে একটি সর্বধর্মীয় ঐক্যপরিষদ গঠন করার প্রস্তাবের পক্ষে অনেকেই জোরালো বক্তব্য রাখেন।

পৃথিবীর সকল মহৎ উদ্যোগই কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা জোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে, এটা ইতিহাস। হেযবুত তওহীদও এর ব্যতিক্রম নয়। গত ১৯ বছর ধরে আমাদের বিরুদ্ধে ধর্মজীবী ও এসলাম-বিদ্বেষী শ্রেণি কি কি অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তা তুলে ধরে সেগুলির খণ্ডন করেন দেশেরপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ)।

আমরা বিশ্বাস করি, মানবজাতির মধ্যে বিরাজিত সকল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভেদ অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে তারা এক পরিবারে পরিণত হবে। শান্তিময় নতুন সুর্যোদয়ের পূর্বাভাস হিসাবে সারা দেশে আমরা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব দেখতে পাচ্ছি। এই জাতীয় ঐক্যই একদিন মানবতার বিজয়রূপে সমগ্র বিশ্বকে শান্তিময় করে তুলবে এনশা'আল্লাহ।

বর্ষায় উত্তপ্ত রাজনীতি, সামনে শীতকাল

কোন দিকে যাচ্ছে দেশ?

আতাহার হোসাইন

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক বছরও অতিক্রান্ত হয় নি। অথচ নানা ইস্যুতে আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দেশের রাজনীতি। পাঁচই জানুয়ারির নির্বাচনের পর আচমকা দেশের রাজনৈতিক উত্তাপ কমে গেলেও এর আগের কয়েকটি মাস পাল্টাপাল্টি রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে দেশ অগ্নিগর্ভ রূপ ধারণ করেছিল। এ সময় অনেকের আশঙ্কা ছিল হয়তো দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে চলে যেতে পারে। রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হরতাল-অবরোধ, জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে দেওয়া, মানুষের সম্পত্তি বিনষ্ট করার মধ্য দিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়াই এক প্রকারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সেই দুঃসময়ের স্মৃতি এখনো মানুষের চোখে জ্বল জ্বল করে ভাসে। হাসপাতালের বিছানায় দগ্ধ মানুষের আর্ত-চিৎকার, স্বজনদের কান্না ও পেট গুলিয়ে ওঠা পোড়া মাংসের গন্ধের কথা আজও মানুষের বিস্মরণ ঘটেনি। কিন্তু পাঁচই জানুয়ারির নির্বাচনের পর হঠাৎই সে পরিস্থিতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। কিন্তু সেই পরিবর্তন কি স্থায়ী কোন সমাধান ছিল, নাকি শুধু সাময়িক প্রশমনমাত্র?

যুদ্ধাপরাধের বিচার, জাগরণ মঞ্চের উত্থান, জাগরণ মঞ্চের প্রতিপক্ষ হিসেবে হেফাজতে ইসলামের পাল্টা উত্থান, যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারের মুখোমুখি জামায়াতে ইসলামীর প্রথম সারির নেতাদের বাঁচাতে জামায়াত-শিবিরের আন্দোলন এবং বিএনপির পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি- প্রধানত এই পাঁচটি নিয়ামকই বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতে কাজ করে চলছে। তবে এর সাথে যুক্ত হয়েছে সরকার আরোপিত বিতর্কিত সম্প্রচার নীতিমালা এবং সংসদের হাতে বিচারকদের অপসারণ ক্ষমতা ন্যস্ত করার বিষয়গুলো।

এর মধ্যে হেফাজত ইস্যু আপাতত মিইয়ে গেলেও বাকি নিয়ামকগুলো ইদানীং আবারো চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি যুদ্ধাপরাধের দায়ে ফাঁসির আদেশ পাওয়া জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আপিলের রায়ে তাকে শাস্তি কমিয়ে আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। এই রায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বদ্ধপরিকর আওয়ামী লীগও এক প্রকার গ্রহণ করে নিয়েছে। এর ফলে জাগরণ মঞ্চ সরাসরি সরকারকে

নিজেদের যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রতিশ্রুতি ত্যাগ করে জামায়াতের সাথে আঁতাত করেছে বলে অভিযোগ করে বসেছে। এমনকি জামায়াতের রাজনৈতিক মিত্র এবং জোট প্রধান বিএনপির তৃণমূল থেকেও অনুরূপ অভিযোগ উঠেছে। তারা মনে করছে সাঈদীসহ অন্যান্য নেতাদেরকে বাঁচিয়ে দেওয়ার শর্তে জামায়াতকে হাত করেছে ক্ষমতাসীন দল। এর মাধ্যমে তারা ২০ দলীয় জোটকে ভেঙ্গে দেওয়ার প্রয়াস করছে। জামায়াত তাদের নেতাদের বাঁচিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে সেই ফাঁদে পা দিয়ে দিয়েছে।

অবাক করা বিষয় এই যে, এই রায়ের ব্যাপারে জামায়াতও তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। তারা বলছে সঠিক বিচার হলে সাঈদীর কোন দণ্ডই হোত না, সাঈদী নির্দোষ প্রমাণিত হতেন। রায়ের প্রতিবাদে জামায়াত শিবিরের পক্ষ থেকে গত ১৮ ও ২১ সেপ্টেম্বর হরতাল পালনের ঘোষণা আসে। তবে জামায়াতের এই প্রতিক্রিয়াকে অন্যরা লোক দেখানো কর্মসূচি বলে আখ্যায়িত করেছে। আঁতাতের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের বক্তব্য হচ্ছে, বিচার বিভাগ স্বাধীন বলেই সাঈদীর ফাঁসির আদেশে পরিবর্তন হয়ে আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশের রায় এসেছে। এতে প্রমাণিত হয়, বিচার বিভাগের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্য সফর শেষে গণভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'আওয়ামী লীগ দেশের জন্য কাজ করে। আঁতাতের রাজনীতি করে না। জামায়াতের কাছ থেকে আওয়ামী লীগের কী পাওয়ার আছে? যাদের হাতে বিএনপি দেশের পতাকা তুলে দিয়েছিল, যুদ্ধাপরাধের জন্য তাদের আমরা গ্রেফতার করতে পেরেছি। কয়েকজনের শাস্তি হয়েছে। বিচার করলে আমিই করতে পারবো। আমার হারাবার কিছু নেই।' অন্যদিকে আঁতাত প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মোহিত তার স্বভাব সুলভ ভাষায় একে 'টোটালি রাবিশ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সরকারের সাথে জামায়াতের আঁতাত হচ্ছে এটা জামায়াতই ছড়াচ্ছে। এর সাথে বিএনপিও যুক্ত আছে।' তিনি সাংবাদিকদের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে বলেন, 'যাদের ঘৃণা করি তাদের সাথে কিভাবে আঁতাত হতে পারে?' তাছাড়া তিনি জামায়াতকে 'ব্লাডি পার্টি' হিসেবেও উল্লেখ করেন। গত ২১ সেপ্টেম্বর এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব মন্তব্য করেন।

জামায়াতে ইসলামী এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এমন মনোভাব প্রকাশ করা হলেও বিএনপি এবং জাগরণ মঞ্চের উদ্যোক্তাদের কাছে তা ধোপে টিকছে না। তারা জামায়াত ও সরকারের মধ্যে গোপন আঁতাতের বিষয়ে অনড় মনোভাব পোষণ করছে। সাংগঠনিকভাবে এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করা হলেও জামায়াতের আচরণে বিএনপি নেতৃত্ব যে সন্দিহান তা অনেকটাই পরিষ্কার। তবে তৃণমূল পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা এখন চরমে। বিএনপি ও জামায়াতের অনলাইন এক্টিভিস্টরা এ ব্যাপারে সব রাখ-ঢাক বাদ দিয়ে সরাসরি একে অপরকে বেঈমান বলে দোষারোপ করছে। জামায়াত সমর্থকরা দাবি করছে, জামায়াতের শক্তি ছাড়া বিএনপি রাজপথে নামতেই পারবে না। অপরদিকে বিএনপি সমর্থকরা বলছেন, জামায়াত বিএনপি থেকে আলাদা হলে বিএনপি পবিত্র হবে। যুদ্ধাপরাধীদের প্রশ্রয় দেওয়ার যে অভিযোগ বিএনপিকে সহ্য করতে হচ্ছে তা থেকে দলটির মুক্তি ঘটবে। খাঁটি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিএনপিকে তখন আপামর জনতা নিরঙ্কুশভাবে সমর্থন করবে। পাশাপাশি ইতোমধ্যেই জামায়াত ছাড়া বিএনপির লাভ ক্ষতি বিচার করে বিশ্লেষকগণ তাদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরছেন। তাদের অনেকেরই অভিমত, বিএনপি থেকে জামায়াত আলাদা হলে লাভ বিএনপিরই হবে। এতে করে প্রমাণিত হবে আওয়ামী লীগ একটি নীতিহীন দল। তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে মোটেও আন্তরিক নয়। ভোট পাওয়ার আশায় শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের আবেগকে তারা পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে। অপরদিকে জামায়াতে ইসলামীও নিজেদের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের রক্তের সাথে বেঈমানী করে যদি সরকারের সাথে আঁতাত করে থাকে তাহলে এই দলটির দিক থেকে জনগণ এবার চূড়ান্তভাবে মুখ ফিরিয়ে নেবে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন।

আর স্মরণ করার বিষয় এই যে, এক সময়ের প্রবল প্রতাপশালী জাগরণ মঞ্চও আজ প্রায় নিঃশেষিত। এখন তার ক্ষীণ কণ্ঠ কোন

আক্রান্ত জনতার সম্পদ

প্রভাব ফেলতে পারে না। জাগরণ মঞ্চ নিজেরাই আজ দ্বিমুখী-ত্রিমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত। অথচ এক সময় ইমরান সরকারের নেতৃত্বাধীন জাগরণ মঞ্চের এই আন্দোলনকে সরাসরি সমর্থন যুগিয়েছিল সরকার। ফলে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা ইমরান এইচ সরকার তৎকালীন সরকারের সমর্থনে এক অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। তার কথায় তখন খোদ প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদও কর্মসূচি পালন করেছিল। মঞ্চের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করে যুদ্ধাপরাধের বিচারের ধারায় রাষ্ট্রপক্ষের আপিলের আইন সংযুক্ত হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ পুনর্বিচারের রায়ে কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়। কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র। দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর দণ্ড কমিয়ে দেয়ার পর সেই ইমরান এইচ সরকারের নেতৃত্বে গণজাগরণ মঞ্চের নেতাকর্মীরা মাঠে নেমে এলে পুলিশ তাদেরকে বেদম প্রহার করেছে। তাদেরকে রাস্তায় দাঁড়াতেই দেয়া হয়নি। পুলিশের গরম পানির তোড়ে, বেদম লাঠিচার্জে হাসপাতালের বিছানায় তাদেরকে শয্যাশায়ী হতে হয়েছে। জাগরণ মঞ্চের একনিষ্ঠ কর্মীরা সাধারণত বাম ঘেষা রাজনীতির সাথে জড়িত। যতদিন সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে ছিল তত দিন তারা ক্ষমতাসীন সরকারকে সমর্থন জানিয়ে গেছে। কিন্তু সাঈদীর সর্বশেষ রায়ে সরকারের উপর তাদের বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। তারা এখন প্রকাশ্যে সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করছে।

এদিকে আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রীরা নিজেরাই বিভিন্ন সময় বে-ফাঁস মন্তব্য করে দলের জন্য বিপদ ডেকে আনছেন। সম্প্রতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রী গণমাধ্যমকর্মীদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করে বিতর্ক সৃষ্টি করেন। তবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী এই ক্ষেত্রে সব সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি ইসলামের অন্যতম এবাদত হজ্ব ও মহানবীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর বক্তব্য প্রদান করে ব্যাপক বিতর্কের সূচনা করেছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় দেশের সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল ও ভার্চুয়াল জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সর্বত্র জোরালো দাবি উঠেছে তাকে যেন মন্ত্রিত্ব থেকে বহিষ্কার এবং গ্রেফতার করে শাস্তির আওতায় আনা হয়। সর্বশেষ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগে মামলা ও আদালতে রিট করা হয়েছে। একই সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশ ও ভাঙচুরের খবর পাওয়া গেছে। ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো তার শাস্তির দাবিতে সরকারকে আল্টিমেটাম দিয়েছে। অন্যথায় তারা হরতাল দেবে বলেও ঘোষণা দিয়েছে। বিশ দলীয় জোটের পক্ষ থেকেও মন্ত্রীর শাস্তি দাবি করা হয়েছে। সচেতন মহল ধারণা করছেন, এই ইস্যুটিকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

সাধারণত বাংলাদেশে বর্ষাকালে রাজনৈতিক উত্তাপ অনেকটাই স্তিমিত থাকে, শীতকালে গরম হয়। কিন্তু উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে আরো দুটি ইস্যু তুলে দিয়ে সরকার গণমাধ্যম কর্মী এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। গণমাধ্যম কর্মীগণ দাবি করছেন সাম্প্রতিক আরোপিত সম্প্রচার নীতিমালার মাধ্যমে সরকার গণমাধ্যমের কণ্ঠ চেপে ধরার প্রয়াস করছে। তারা আরো দাবি করছে, এর মাধ্যমে সরকার প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, সরকার

এদেশের রাজনৈতিক সংঘাতের বলি নিরীহ সাধারণ মানুষ, দুনিয়াজোড়া একই দৃশ্য

জবাবদিহিতায় মোটেও বিশ্বাসী নয়। এটা গণতন্ত্রকে হত্যার নামান্তর বলেও আখ্যা দিচ্ছেন তারা। এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগের অতীত বাকশালী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে বলে তাদের অভিযোগ। পাশাপাশি বিচারকদের অভিশংসন ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত করার মাধ্যমে সরকার বিচার বিভাগকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এ লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধমে আইনটিকে কার্যকর করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ৪০ বছর পর সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের কাছে ন্যস্ত হলো। ঐ দিন রাত সাতটা ৪০ মিনিটে আইনমন্ত্রী বিলটি বিবেচনায় নেওয়ার জন্য স্পিকারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এরপর বিলের ওপর দেওয়া নোটিশ নিস্পত্তি শেষে রাত ১১টা নয় মিনিটে তা বিভক্তি ভোটে পাস হয়। বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৩২৭টি, বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি। এর আগে বিলের দফা ও সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর বিভক্তি ভোট হয়। তা ৩২৮-০ ভোটে পাস হয়। গত ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে তা অবশেষে আইনেও পরিণত হয় (সূত্র: দৈনিক বজ্রশক্তি, ২৩/০৯/২০১৪)।

এদিকে এ আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে নানা সমস্যায় আক্রান্ত (যেমন জোটে ভাঙ্গন, প্রচুর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার খড়গ, সরকার ও প্রশাসনের যুদ্ধংদেহী মনোভাব) বিএনপি ২২ সেপ্টেম্বর, সোমবার এক দিনের হরতাল পালন করেছে। পাশাপাশি এ নিয়ে সারা দেশে ব্যাপক প্রতিবাদ সমাবেশ ও নানা ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে দেখা যায় সর্বত্র সরকারের বিরুদ্ধে একটি অসন্তোষ বিরাজ করছে। পাঁচই জানুয়ারির নির্বাচন সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় পশ্চিমা দেশগুলোও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আসছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বার বার জোরালোভাবে সব দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছে। তাদের দাবি পূরণ না করায় ইতোমধ্যেই দেশের পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে।

এমতাবস্থায় সরকার জামায়াতকে হাত করার মাধ্যমে বিএনপিকে দুর্বল করে একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন করতে পারে বলেই জামায়াতের সাথে আঁতাতে গিয়েছে বলে কোন কোন মহলে একটি জোরালো আলোচনা চলছে। 'রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই' এই মতবাদে বিশ্বাসী রাজনীতিকদের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। তাই কিছু দিনের মধ্যেই ২০ দলীয় জোটে ভাঙ্গন এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঘোষণা এলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

কিন্তু পশ্চিমাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নির্বাচন করা হলেও বাস্তবিক পক্ষে আমাদের জন্য তা কতটুকু মঙ্গল বয়ে আনবে- এটাই এখনকার মুখ্য জিজ্ঞাসা। আমাদের রাজনীতিতে চলমান নীতিহীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ক্ষমতার প্রতি লালায়িত হয়ে 'সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ' বানিয়ে, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, অন্যায় দোষারোপ, গোপন আঁতাত ইত্যাদি বদ-গুণ বজায় রেখে কি আমরা সুখী, সমৃদ্ধ ও একতাবদ্ধ শক্তিশালী ভবিষ্যৎ আশা করতে পারি? যদি তা নাই পারি তবে কেন আমাদের এই রাজনীতি, কেনইবা নীতিহীন এই রাজনীতির প্রতি আমাদের এই নিঃশর্ত আনুগত্য? আমরা কি পারি না ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের এই আচরণের সমুচিত জবাব প্রদান করতে? কোন শক্তি আমাদেরকে তাদের হাতে বন্দী করে রেখেছে, আমরা কেন এত নির্জীব হয়ে গেছি তা কি নতুন করে ভেবে দেখার সময় আসে নি?

বিশ্বময় উত্তপ্ত পরিস্থিতি শুরু হয়ে গেছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ!

আতাহার হোসাইন, মোহাম্মদ আসাদ আলী, রাকীব আল হাসান

শিরোনাম শুনে পাঠকের হয়তো মনে হতে পারে লেখক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একটি সাধারণ বিষয়কে বড় করে তোলার চেষ্টা করছেন। না, পাঠক! এখানে মোটেও বাড়িয়ে কিছু বলা হচ্ছে না। সত্যি সত্যি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আজ নয়। আজ থেকে আরো তেরো বছর আগেই কিংবা তারও আগে এর সূচনা ঘটে গেছে। কিন্তু আমরা বেখেয়াল। অনেকের কাছে এটাকে অতি স্বাভাবিক মনে হতে পারে। যেমন আল্লাহ কোর'আনে কেয়ামত প্রসঙ্গে বলছেন, 'যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে এবং মানুষ (অবাক হয়ে) বলবে, এর কি হল (সুরা যিলযাল- আয়াত ১-৩)?' অর্থাৎ মানুষ বুঝতেই পারবে না যে এর ধ্বংস শুরু হয়ে গেছে। ঠিক এমন ঘটনাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে ঘটেছিলো ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। সেদিন যখন টুইনটাওয়ার নামে খ্যাত বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে ছিনতাইকৃত দু'টি বিমান পর পর আছড়ে পড়লো তখন অনেক মানুষ বুঝতেই পারেনি যে সেখানে কি ঘটতে চলেছে। এমন কি অনেকে একে সিনেমার শ্যুটিং মনে করে আমলে নেয় নি। অথচ কী সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেদিন! মার্কিনীদের গর্বের টুইন টাওয়ার সেদিন মাটির সাথে মিশে গিয়ে প্রায় তিন হাজার সাধারণ মানুষের মৃত্যু বয়ে এনেছে মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। সেই ঘটনাটিকে কেন্দ্র বানিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন সরকার জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রের মতামতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করে বসে। সেই থেকেই সূত্রপাত হয়েছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে এর প্রেক্ষাপট কিঞ্চিৎ পৃথক। কিন্তু সেটা বহিরাবরণের পার্থক্য, অভ্যন্তরে সেই একই ধ্বংস, অশ্রু, মৃত্যু, বিশ্ব-অর্থনীতির মন্দা প্রভৃতি। এরপর কিছুদিন না যেতেই আবার গণবিধ্বংসী বোমা থাকার মিথ্যা অজুহাতে আক্রমণ চালানো হল ইরাকে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, পোল্যান্ড এবং কুর্দিস্তানি পেশমেগ্রা সামরিক বাহিনীর সমন্বিত আক্রমণে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ সেখানে হত্যা করা হল যার অধিকাংশই ছিল বেসারমরিক। এটা ছিল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্ববৃহৎ রণক্ষেত্র।

মানুষ এতটা বে-খেয়াল এবং উদাস কেন ও কি করে হয়? কারণ, সে জীবনের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে যায় যে, সে মনে করে সে চোখে যা দেখে তাই সত্য। আর যা দেখা যায় না তার অনুভবই সে করতে পারে না। এটাই হচ্ছে বস্তুবাদ। বস্তুবাদ মানুষকে মানবিক গুণাবলী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাকে পশুতে পরিণত করে। দাম্ভিকতা ও আধিপত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান করে। সে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টির কারণে দেখতে পায় না যে তার কর্ম তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

আজকের পৃথিবীর দিকে একটু ভাল করে তাকিয়ে দেখুন। সম্ভবত- সম্ভবত নয়- মানুষের জানা ইতিহাসে বর্তমানেই মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নব নব আবিষ্কার, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে এতটাই সফলতা লাভ করেছে যে, সে আজ তার অতীতের দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। মানুষ আজ আকাশের বিদ্যুৎকে বেঁধে চাকরের মত খাটাচ্ছে, তাকে সেবা প্রদানে বাধ্য করছে। যে বিশাল আকাশ, যে হিমালয়কে সে দেও-দানবের আবাসস্থল ভাবতো তাকে সে জয় করে নিয়েছে। মানুষ চাঁদে পা রেখেছে বহু আগেই। ভীনগ্রহে নভোযান পাঠিয়েছে। মানুষের পাঠানো হাজার হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করছে, যা তাকে আবহাওয়া ও গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করছে। সে আশা করছে হয়তো আর কিছু দিনের মধ্যেই সে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াবে। উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু এখন তার কাছে সাধারণ বিষয়। এই একটি দিক দিয়ে মানুষের এই পরম উন্নতি হলেও মানুষ অন্য একটি দিক দিয়ে, মানবিকতার দিক দিয়ে চরম অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়েছে। এই মানুষই গত শতাব্দীতে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ১১ কোটিরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথমবারের মত মানুষ ব্যবহার করেছে আণবিক বোমা। জাপানের হিরোশিমা নগরীতে একটিমাত্র বোমা (লিটল বয়) মেরে মুহূর্তে দেড় লাখ মানুষ হত্যা করার পরও তাদের সামান্যতম অনুশোচনা হয় নি। তার মাত্র তিন দিন পরেই আবারো নাগাসাকিতে আরো একটি আণবিক বোমার (ফ্যাট ম্যান) বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রাণ নিয়েছে প্রায় এক লাখ মানুষের। তাছাড়া অন্যান্য সময় সংঘটিত বিভিন্ন আঞ্চলিক যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছে আরো বহু সংখ্যক আদম সন্তান। আর এই মুহূর্তেও পৃথিবীর বহু দেশে যুদ্ধ চলছে। প্রায় ৫৪ টি দেশের সম্মিলিত জোট যুদ্ধ করছে সিরিয়া ও ইরাকের বিশাল এলাকা দখলকারী আইএস (ইসলামিক স্টেট) এর বিরুদ্ধে। অথচ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্থাৎ বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করা দেশের সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশের কোটায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে বর্তমানের এই যুদ্ধের একটি বড় পার্থক্য হচ্ছে আক্রমণকারী ও আক্রান্তের মধ্যে চরম অসমকক্ষতা। ইরাক, আফগান বা আইএস এর সঙ্গে আক্রমণকারী পরাশক্তিগুলির শক্তি-সামর্থ্যের কোন তুলনাই চলে না। এ যেন ইঁদুরের উপর সিংহের আক্রমণ।

আইএস হচ্ছে সে শক্তি যারা বেশ কিছু দিন যাবৎ ব্যাপকভাবে বিরোধী মতের বিরুদ্ধে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আসছে ইরাক ও সিরিয়ার একটি বিশাল এলাকা জুড়ে। মজার ব্যাপার হচ্ছে সিরিয়ায় যুদ্ধরত এই আইএস আল-কায়দার ন্যায় কিছুদিন আগেও যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সৌদি আরবসহ ইউরোপীয়দের সহযোগিতা পেয়ে আসছিলো। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে আইএসকে অর্থ, অস্ত্র ও সমর্থন দিয়ে বড় করে তুলেছিল তারাই। এই যুদ্ধের বিপক্ষে মত দিয়েছে সিরিয়ার মিত্র বিশ্বের আরেক পরাশক্তিধর দেশ রাশিয়া। এই তালিকায় রয়েছে ইরানও। কিন্তু এই যুদ্ধে তাদের নেতিবাচক হুঁশিয়ারিকে অবজ্ঞা করে ঠিকই সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে হামলা চালানো হয়েছে সিরিয়ার অভ্যন্তরে। আর পরমাণু প্রকল্প নিয়ে ইরানের সাথে পশ্চিমাদের ইঁদুর-বিড়াল খেলাতো চলছে বহু দিন ধরেই।

আর এর আগে টুইনটাওয়ার হামলার পরিপ্রেক্ষিতে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নাম দিয়ে বিশ্বের অধিকাংশ দেশকে একত্রিত করে শুরু হয়েছিল আল-কায়েদাবিরোধী এক যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান বিধ্বস্ত হয়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তান, ইয়েমেনসহ বিশ্বের বহু দেশে এই যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আরব বসন্তের হাত ধরে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ এলোমেলো হয়ে গেছে। ইরাকের যুদ্ধ আজও শেষ হয়নি। কবে শেষ হবে তার কোন ইঙ্গিতও নেই। ব্যাপক অর্থ ও অস্ত্রের ক্ষয়-ক্ষতি এবং সৈন্যদের প্রাণহানী স্বীকার করে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের বাহিনী সেখান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কয়েকদিন না যেতেই সেখানে বসানো ইরাকি সেনাদেরকে হটিয়ে বিশাল এলাকা দখল করে নিয়েছে আইএস নামের সদ্যপ্রসূত দলটি।

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল কর্তৃক অবরুদ্ধ আরেক দেশ ফিলিস্তিনে এই কিছুদিন আগেও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধা হামাসের রকেট হামলার জবাবে ইসরাইল ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে মাসাধিক কালব্যাপী প্রায় হাজার দুয়েক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ। বর্তমানে এই যুদ্ধে অস্ত্র বিরতি চললেও বিচ্ছিন্নভাবে এখনও একে অপরকে আক্রমণ করছে। সেখানে যুদ্ধ শুরু হতে কোন আগাম ঘোষণার দরকার নেই। অতীতে বহুবার সেখানে এমনটা হয়েছে। অপরদিকে ক্ষুধার মহাদেশ আফ্রিকাও আজ অশান্ত। নাইজেরিয়ায় বোকোহারাম ইসলামের পবিত্র যুদ্ধ 'জেহাদ' এর নামে নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালিত করছে। তারা সে দেশের সেনাবাহিনীর সাথেও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলোও বোকোহারামের উত্থানের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। অপরদিকে সেন্ট্রাল আফ্রিকায় উগ্র খ্রিস্টানদের হাতে নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়ে ব্যাপকহারে নিহত হচ্ছে সেখানকার মুসলিম সম্প্রদায়।

এদিকে গণভোটের মাধ্যমে ইউক্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার সাথে অঙ্গীভূত করা নিয়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সাথে অবিরাম দ্বন্দ্ব চালিয়ে যেতে হচ্ছে রাশিয়াকে। ক্রিমিয়ার সফল অঙ্গীভূত হওয়ার পর এবার ইউক্রেনের দোনেৎস্ক প্রদেশেও সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়েছে একই লক্ষ্য নিয়ে। ইউক্রেন এবং ইউক্রেনের পশ্চিমা মিত্র দেশগুলোর দাবি এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকামীদের সহযোগিতা করছে রাশিয়া। এই নিয়ে রাশিয়ার সাথে চলছে উত্তপ্ত ভাব বিনিময়। দফায় দফায় একে অপরের উপর অবরোধ আরোপ চালিয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এটাই রাশিয়ার সাথে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব বলে বিশ্লেষকগণ মনে করছেন।

এদিকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত নিয়েও উত্তেজনা চলছে। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর ছেলে ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো ঘোষণা দিয়েছেন, যে কোন মূল্যে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করা হবে। তার এই ঘোষণার পর দুটো দেশের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে ভারতের উত্তেজনা চলছে চীনের সাথেও। চীন সম্প্রতি ভারতের সীমান্তে ব্যাপক সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। পাশাপাশি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে গিয়ে সেনাবাহিনীকে আঞ্চলিক যুদ্ধের প্রস্তুতির আদেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে চীনের অভ্যন্তরে উইঘর সম্প্রদায় সরকারি বাহিনীর নির্যাতনের মুখে পড়ে বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। আর উত্তর কোরিয়া কয়েকদিন পর পরই পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া ও তার মিত্র যুক্তরাষ্ট্রকে হামলা করার হুমকি প্রদান করেই যাচ্ছে।

অর্থাৎ পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই সর্বত্রই যুদ্ধ যুদ্ধ একটা পরিবেশ। বাস্তবিক অর্থেও অনেক দেশেই বড় ধরনের যুদ্ধ চলমান আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেখানে মাত্র ৩০টি দেশ জড়িত ছিল সেখানে এখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যুদ্ধে লিপ্ত আছে। এক আইএসকে ধ্বংস করতেই যুদ্ধে নেমেছে

পৃথিবীর ৫৪টি দেশ। সে সময় প্রতি দিন যে পরিমাণ অস্ত্রের ব্যবহার ও মানুষের মৃত্যু হতো আজ তার পরিমাণ কোন অংশেই কম নয়। সেই হিসেবে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলছে বলেই স্বীকার করে নেওয়া যায়। আর যদি কেউ আমার সঙ্গে দ্বিমত করেন, তবে এ কথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না যে, যে কোন সময় এই চলমান সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করে বিশ্বযুদ্ধের 'কাঙ্ক্ষিত' রূপ পরিগ্রহ করবে। কারণ, যুদ্ধের জন্য সমস্ত উপাদান ও ক্ষেত্র ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা কেমন করে হয়েছিল তা একবার স্মরণ করতে পারি (১৯১৪ সালের ২৮ জুন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফ্রানৎস ফার্ডিনান্ড এক সার্বিয়াবাসীর গুলিতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া এ হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং ওই বছরের ২৮ জুন সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে দুদেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়- সূত্র উইকিপিডিয়া)। আর সেই বিশ্বযুদ্ধের সূচনা সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ লিখেছেন "We all slithered into it" অর্থাৎ "আমরা কেমন যেন এর মধ্যে পিছলিয়ে পড়ে গেলাম।" সুতরাং ঘোষিত যুদ্ধ শুরু হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এমন কি যুদ্ধ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে- এই বক্তব্যের পেছনে যুক্তি হচ্ছে- এখন সেই যুগ নেই যে বলে কয়ে এবং যুদ্ধের দিনক্ষণ ঠিক করে হাতি- ঘোড়া নিয়ে ময়দানে হাজির হতে হবে। বর্তমানে পৃথিবীর একপ্রান্তে যুদ্ধাস্ত্র সাজিয়ে রেখে ভিন্নপ্রান্তের শত্রুকে হামলা করা যায়। ইতোমধ্যে সেই আকারে হামলা চলমানও আছে। অন্যথায় আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত আছি এটা প্রমাণের জন্য আমাদেরকে সেই দিনের অপেক্ষা করতে হবে যে দিনটি শুরু হবে পারমাণবিক বোমা হামলার ধ্বংসযজ্ঞ দিয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেখানে আণবিক বোমা দিয়ে তার সমাপ্তি হয়েছিল।

পৃথিবীর এই অবস্থার পেছনে যে কারণগুলো নিহিত আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধর্ম, জাতীয়তা ও আধিপত্যবাদ বিস্তারকে কেন্দ্র করে। অথচ এই সমস্যাগুলো নির্মূল করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজসাধ্য বিষয়। মানুষ তার সত্যিকার পরিচয় ভুলে যাওয়ায়-ই এমনটা হতে পেরেছে। মানুষ মূলত সবাই একই স্রষ্টার সৃষ্টি এবং আদি পিতা ও মাতা আদম হাওয়ার সন্তান। সকলের দেহে বহমান আছে একই রক্তের ধারা। কালপরিক্রমায় ও ভৌগোলিক ব্যবধানে তাদের গায়ের রঙ ও ভাষায় ভিন্নতা এসেছে। তাদের আচরিত ধর্মের নাম ভিন্ন হলেও স্রষ্টার দেওয়া সব ধর্মেরই মূলবাণী মানুষে মানুষে শত্রুতা, হিংসা, বিভেদ, দূরত্ব ইত্যাদি নির্মূল করে ভাই ভাই হয়ে যাওয়া। সামান্য ভিন্নতাকে আশ্রয় করে, পারস্পরিক শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়া মানুষের মর্যাদার পক্ষে বড়ই বে-মানান। তাই মানুষের উচিৎ তার আদি পরিচয়ে ফিরে যাওয়া। মানুষের ভেবে দেখা উচিৎ এই যুদ্ধের মাধ্যমে সে কার ক্ষতি করছে, কাকে হত্যা করছে, কার সম্পদই বা নষ্ট করছে। সে যাকে মারছে সে তারই ভাই, তারই আপনজন। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে দেওয়া এক বক্তব্যে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন সমরাস্ত্রের পেছনে অর্থ ব্যয় বন্ধ করে শিক্ষার পেছনে এই অর্থকে কাজে লাগায়, যাতে মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে শান্তি ও অহিংসার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে (সূত্র: দৈনিক দেশেরপত্র- ২৬ শে সেপ্টেম্বর ২০১৪)। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের একজন প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য অহংকারীদের কর্ণকুহরে কতটা প্রবেশ করবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকেই যায়। কিন্তু বর্তমানের এই দুঃখজনক অবস্থায়ও পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার এক অনন্য সুযোগ গ্রহণ করতে পারে মানবজাতি- যদি সে তার আদি পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। সেই পরিচয় হচ্ছে, সবাই তারা একই পিতামাতার সন্তান। সবাই তারা ভাই ভাই, সবাই একই পরিবারের সদস্য। একমাত্র মানুষের পক্ষেই এভাবে ইউটার্ন নিয়ে পরিস্থিতি পাল্টে ফেলা সম্ভব। মানুষের সেই যোগ্যতা ও সামর্থ উভয়ই রয়েছে। কেননা মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু মানুষ সে সুযোগকে গ্রহণ করে নিজেরাসহ আমাদের আগামী প্রজন্মকে এই ভয়াবহ আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাবে কী?

অন্য আলোয় দেখা: আল্লাহর পছন্দনীয় ধর্ম কোনটি?

রিয়াদুল হাসান

শান্তির অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে ঐক্য। এই জন্য আমরা যখন পৃথিবীতে বিরাজিত ধর্মগুলির অনুসারীদের নিয়ে এক জাতি গড়ার লক্ষ্যে সেমিনার, সভা করছি তখন এসলাম ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা প্রায়ই আমাদেরকে এই প্রশ্নটি করেন যে, আপনাদের কোর'আনেই তো আছে আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে 'এসলাম'। তাহলে আপনারা কিভাবে আমাদেরকে গ্রহণ করবেন? এই প্রশ্নের জবাবে আমাদের বক্তব্য ---

পবিত্র কোর'আনে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

(১) যে কেউ এসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন (জীবনব্যবস্থা) তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত (সুরা এমরান-৮৫)।

(২) আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং এসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে পছন্দ করলাম (সুরা মায়েদা ৪)।

এই আয়াতগুলি থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, আল্লাহ হিন্দু-বৌদ্ধ-ইহুদি-খ্রিস্টান এবং এসলাম ইত্যাদি ধর্মের মধ্যে তিনি অন্যগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং কেবলমাত্র এসলাম তথা শেষ নবী মোহাম্মদ (দ:) এর উম্মত দাবিদার

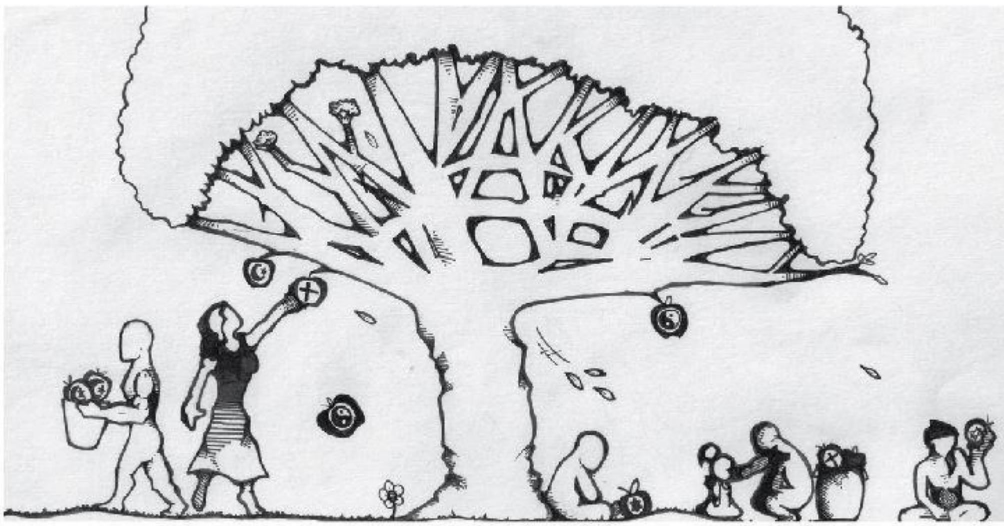

মুসলিম বলে পরিচিত জনগোষ্ঠীকেই একমাত্র মনোনীত জাতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে এসলাম ধর্মের আলেম ওলামারা অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে অন্য ধর্মের অনুসারী সকল মানুষের স্বর্গে যাবার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেন এবং একমাত্র মুসলমানেরাই জান্নাতে যাওয়ার হকদার বলে প্রচার করেন। কিন্তু বাস্তবে এই আয়াতটির মর্মার্থ কিন্তু তা নয়।

সকল নবীর ধর্মই এসলামঃ

প্রথমেই আসি দীন এবং এসলাম এই শব্দ দু'টির অর্থ প্রসঙ্গে। দীন শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গেলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিচারিক বিধি-বিধান প্রয়োজন পড়ে সেগুলি হচ্ছে দীন, ইংরেজিতে বলা হয় System of life। এই দীন, জীবনব্যবস্থা বা System of life হতে পারে মাত্র দুই প্রকারঃ আল্লাহর দেওয়া অথবা মানুষের তৈরি। আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর নবী-রসুল-অবতারদের মাধ্যমে যে দীনগুলি পাঠিয়েছেন সেগুলির নাম তিনি দিয়েছেন 'এসলাম'। 'এসলাম' শব্দের অর্থ শান্তি। এর তাৎপর্য হচ্ছে- এটি এমন এক জীবনব্যবস্থা যার পরিণামে মানবসমাজে নেমে আসবে অনাবিল শান্তি। তাই শান্তিই হচ্ছে সকল দীনের উদ্দেশ্য এবং উপরোক্ত আয়াত যেখানে আল্লাহ বলছেন যে, 'এসলাম' ব্যতীত আর কোন দীনকে কবুল করা হবে না, সেখানে তিনি এই শাশ্বত চিরন্তন জীবনবিধানকেই বুঝিয়েছেন যা তিনি তাঁর প্রত্যেক নবী-রসুলকে দিয়ে পাঠিয়েছেন। নবী-রসুল-অবতারদের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষের মনগড়া অন্যান্য যে জীবনবিধানগুলি যুগে যুগে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলিকেই মহান আল্লাহ গ্রহণ করবেন না।

একজন নবীর আনীত শিক্ষা যখন কালক্রমে বিকৃত করে ফেলা হয় তখন আরেকজন নবী আসেন এবং সেই পূর্বতন নবীর প্রকৃত শিক্ষাকেই সত্যায়ন ও নবায়ন করেন। তাঁরা কেউই পূর্বতন নবীর মূল শিক্ষায় কোন পরিবর্তন করেন না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মুসার (আঃ) শিক্ষাকে সত্যায়ন করার জন্যই ঈসার (আঃ) আবির্ভাব। ঈসা (আঃ) নতুন কোন বিধান নিয়ে আসেন নি, তাঁর প্রচারিত শিক্ষার (ইঞ্জিল) মধ্যে মানুষের জাতীয়-রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার মত কোন আইন-কানুন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা দণ্ডবিধি পাওয়া যায় না। ধর্মের আত্মা হচ্ছে মানবতা, কিন্তু তওরাতের ধারক-বাহকদের কাছে মানবতার চেয়ে শরিয়তের বিধিনিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করাই বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার ফলে ধর্ম হয়ে পড়েছিল ভারসাম্যহীন। ঈসা (আঃ) এসে আবার মানবতার পুনস্থাপনা করে ধর্মকে তার যথাস্থানে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টা ইহুদি ধর্মব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রে সফল হতে পারে নি।

পূর্ববর্তী গ্রন্থের বিধান কি বাতিল?

মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) যখন মদীনায় রাষ্ট্রগঠন করলেন তিনি ইহুদি বা খ্রিস্টানদের উপর কোর'আনের বিধি-বিধান চাপিয়ে দেন নি। এবং ইহুদিরাও আল্লাহর রসুলকে শাসক হিসাবে মেনে নিলেও বিচারক হিসাবে মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আল্লাহর রসুলও তাদেরকে তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী তওরাতের বিধান দিয়েই বিচার করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তওরাতে যে বিধান দিয়েছেন সেই বিধান যদি ইহুদিরা মান্য করে সেটাই যথেষ্ট। বরঞ্চ আল্লাহ সেদিকেই তাদেরকে আহ্বান করেছেন, কোর'আন মানতে জোর করেন নি। কারণ তওরাতও আল্লাহরই হুকুম। তিনি পবিত্র কোর'আনে প্রশ্ন রেখেছেন যে,

"তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তওরাত রয়েছে। তাতে আল্লাহর নির্দেশ আছে। অতঃপর তারা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কখনোই বিশ্বাসী নয়। আমিই তওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে রয়েছে হেদায়াত ও আলো। আল্লাহর আজ্ঞাবহ নবী, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদিদেরকে ফায়সালা দিতেন। কেননা তাদেরকে এই ঐশীগ্রন্থের তত্ত্বাবধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তারা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করনা, আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা (হুকুম) করে না, তারাই কাফের (সুরা মায়েদা ৪৩-৪৪)।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট হলো যে, কেবল কোর'আন দিয়েই যে ফয়সালা দিতে হবে তা আল্লাহ বলেন নি, তিনি বলেছেন 'আনযালাল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান। বেদ, তওরাত, জিন্দাভেস্তা, ত্রিপিটক, যবুর, ইঞ্জিলও আল্লাহর অবতীর্ণ, সুতরাং সেগুলি দিয়ে ফয়সালা দিলেও সেটা এসলামেরই ফয়সালা, সেটাই সমাজে শান্তি আনবে। আর কাফের তো তারাই যারা আল্লাহর কোন বিধান দিয়েই ফয়সালা দিতে রাজি না, যারা নিজেদের মনগড়া বিধানের পক্ষপাতি। সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সেটা শান্তি আনবে না।

একইভাবে আল্লাহ ঈসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিলের

অনুসারীদেরকে কোর'আনের বিধান মানতে জোর করেন নি। তিনি বলেছেন, 'আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করে পথপ্রদর্শন করে এবং এবং এটি মোত্তাকীদের জন্য হেদায়াতসহ উপদেশবাণী। ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিৎ আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই ফাসেক (অবাধ্য) (সুরা মায়েদা ৪৬-৪৭)।

পূর্বেই বলেছি, ঈসা (আ:) জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য কোন নতুন শরীয়াহ আনেন নি, তিনি ইহুদিদেরকে তওরাতের বিধানকেই মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে বনী ইসরাইল! আলেমেরা ও ফরীশীরা শরীয়ত শিক্ষা দেবার ব্যাপারে মূসা (আ:) এর জায়গায় আছেন। সুতরাং এরা যা কিছু করতে আদেশ করেন তোমরা তা পালন করো। কিন্তু তাঁরা যা করেন সেটা তোমরা অনুসরণ করো না, কারণ তাঁরা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না।' (নিউ টেস্টামেন্ট: ম্যাথু ২৩:২-৩)।

একইভাবে বৈদিক ধর্ম যখন আত্মাহীন হয়ে গিয়েছিল তখন সর্বজীবে করুণার বাণী নিয়ে এসেছিলেন গৌতম বুদ্ধ (আ:)। স্বামী বিবেকানন্দ গৌতম বুদ্ধকে নবী ঈসার (আ:) সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, "বুদ্ধদেব এর শিষ্যগণ তাঁহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ইহুদিধর্মের সহিত খ্রিস্টানধর্মের যে সম্বন্ধ, হিন্দুধর্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্মের সহিত বর্তমানকালের বৌদ্ধধর্মের প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। যিশুখ্রিস্ট ইহুদী ছিলেন ও শাক্যমুনি (বুদ্ধদেব) হিন্দু ছিলেন। শাক্যমুনি নতুন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। যিশুর মতো তিনিও (পূর্ব ধর্মমতকে) 'পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই।'" [বিশ্বধর্ম মহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা]।

একটি উদাহরণ:

একটি বৃক্ষের মধ্যে বহু শাখা প্রশাখা ও অসংখ্য পত্র-পল্লব থাকে, কিন্তু সেগুলি সব একই বৃক্ষের পরিচয় বহন করে, তারা একই বৃক্ষের অংশ হিসাবে পরিচিত হয়। বৃক্ষে যে ফল ধরে তার নামে ঐ বৃক্ষের নামকরণ হয়। তেমনি আল্লাহ যে জীবনব্যবস্থা যুগে যুগে নাজেল করেছেন সবগুলি মূলত একই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা এবং সেই বৃক্ষের ফল হচ্ছে শান্তি। ফলের নামে এই দীনরূপ বৃক্ষের নাম আল্লাহ রেখেছেন এসলাম বা শান্তি। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, একমাত্র যে জীবনব্যবস্থায় শান্তি আসবে সেটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা। একই বৃক্ষের ভিন্ন শাখায় যেমন পৃথক ফল ধরে না, তেমনি কোন ধর্মেই অশান্তি হয় না, সকল ধর্মই শান্তিময়। তাই আদম (আ:) থেকে শুরু করে শেষ নবী মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত যে শাশ্বত জীবনব্যবস্থা আল্লাহ পাঠিয়েছেন সেগুলি আলাদা আলাদা দীন নয়, সেগুলি একই দীন। এজন্য এর আরেক নাম দীনুল কাইয়্যেমাহ বা সনাতন জীবনব্যবস্থা- যে জীবনব্যবস্থা আদি, নিত্য, চিরন্তন, যা ছিল-আছে-থাকবে। খানিক আগে যে কথাটি বলে আসলাম যে, প্রতিটি ধর্মের মূল শিক্ষায় এবং ভিত্তিতে কোন পার্থক্য আসে নি। সেই মূল শিক্ষা হচ্ছে- স্রষ্টার শর্তহীন আনুগত্যই শান্তির মূল। তাদের উপাসনা পদ্ধতি যতই আলাদা হোক, উপাস্য তো আলাদা নয়। প্রতিটি ধর্মের মানুষ যদি সেই সৃষ্টিকর্তার বিধান মেনে চলতে সম্মত থাকে, সেই বিধান বেদেরই হোক, তওরাতেরই হোক, ইঞ্জিলেরই হোক, যবুরেরই হোক বা কোর'আনেরই হোক তারা অবশ্যই সামগ্রিক জীবনে শান্তির দিকে ধাবিত হবে। যে আয়াতে আল্লাহ এসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করবেন না বলে ঘোষণা দিচ্ছেন তার আগের আয়াতটি লক্ষ্য করুন। সেখানে তিনি বলছেন, 'তারা কি আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন তালাশ করছে। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। বলুন, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর আর যা কিছু পেয়েছেন এবং যা কিছু পেয়েছেন মুসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবী রসুলগণ তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারও মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা আল্লাহরই অনুগত।' (সুরা এমরান ৮৩-৮৪)

প্রকৃত এসলামের বৃক্ষের সন্নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে আরেকটি বৃক্ষ যার ফলগুলি বিষাক্ত। এটা হচ্ছে মানবরচিত জীবনব্যবস্থা যার চিরন্তন ফল অন্যায়, অশান্তি, রক্তপাত, ঘৃণা। এই বিষবৃক্ষকে আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করবেন। এ কথাই তিনি বলেছেন যে, এসলাম (শান্তি) ছাড়া আর কোন দীন গ্রহণ করা হবে না।

মানবজাতির শান্তির জন্য যে বিধি বিধান প্রয়োজন তা আল্লাহ অগণিত নবী-রসুলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শেষ রসুল মোহাম্মদ (দ:) এর উপর অবতীর্ণ পবিত্র কোর'আনের মাধ্যমে এসলাম নামক জীবনব্যবস্থার শেষ ইষ্টকখানা সংযুক্ত হয়েছে। আর নতুন কোন বিধান আসবে না, বিধান আসার পর্ব শেষ। একেই আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম (সুরা মায়েদা ৪)। শেষ নবীর উপর আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়েছেন সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ বলেছেন, "তিনি তাঁর রসুল প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্য জীবনব্যবস্থা সহকারে যেন রসুল একে অন্যান্য সকল জীবনব্যবস্থার উপরে বিজয়ী করে"। এখানেও আল্লাহ হিন্দু-বৌদ্ধ-ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মকে নির্মূল করতে বলেন নি, কেবল বলেছেন জাতীয় জীবনে যেন মানুষের মনগড়া বিধান না চালু থাকে, সেখানে যেন আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকে যেন স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের সুযোগ করে দেওয়া হয়। আল্লাহর একটাই চাওয়া, মানুষ যেন মনগড়া বিধান না মেনে তাঁর বিধান মানে। এজন্য আগের বিধানগুলিকে বাতিল করার প্রয়োজন পড়ে না। তিনি রসুলকে তেমনটা করতেও বলেন নি। তিনি বলেছেন, 'হে মোহাম্মদ! আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ যা পূর্ববর্তীয় গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী ফায়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে তা ছেড়ে তাদের মনগড়া বিধানের অনুসরণ করবেন না।' (সুরা মায়েদা ৪৮) রসুলাল্লাহর হাতে গড়া জাতিটি যেখানেই সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানেই অন্য ধর্মের উপাস্য ও উপাসনালয়কে সুরক্ষা দিয়েছেন- এর বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত আছে। তবে শেষ নবী এবং শেষ বিধান এসে গেলেও বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে থেকে ধর্ম-সংস্কারক, মহান ব্যক্তিত্বের

আবির্ভাব হোতেই পারে, তবে তাঁদেরও কাজ হবে সেই অধর্মের বিনাশ ও সাধুদিগের পরিত্রাণ। অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

জান্নাতের পূর্বশর্ত: নবী-রসুল-অবতাদের প্রতি ঈমান:

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমরা যদি সত্যিই চাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক, তাহলে মানবজাতিকে যেভাবেই হোক শান্তির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। যারা নাস্তিক বা নিরিশ্বরবাদী তারাও শান্তি চান, যারা ধার্মিক তারাও শান্তি চান। তাই মানবতার পক্ষে, শান্তির পক্ষে আস্তিক-নাস্তিক, সংশয়বাদী সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। শান্তি আসবে স্রষ্টার বিধানে এটা অব্যয়, অক্ষয় এবং ঐতিহাসিক সত্য। আল্লাহর বিধান মান্য করার অনিবার্য ফল শান্তি ও নিরাপত্তা। আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসীরাও যদি তাদের জীবনে আল্লাহর বিধান মান্য করে অবশ্যই তাদের সমাজ থেকেও সকল অন্যায়, অবিচার লুপ্ত হয়ে শান্তি কায়েম হবে। তবে পৃথিবীতে শান্তিতে থাকা আর পরকালে জান্নাতে যাওয়া নিশ্চয়ই এক বিষয় নয়। পরকালের সঙ্গে বিশ্বাস জড়িত। স্বর্গে যাবার জন্য আল্লাহ যে বিষয়গুলি বিশ্বাস করতে বলেছেন সেগুলি বিশ্বাস করতে হবে। এখানেই প্রশ্ন, এসলামের শেষ সংস্করণ এসে যাওয়ার পরও এসলাম গ্রহণ না করে, পূর্ববর্তী ধর্মবিশ্বাসে স্থির থেকে কেউ কি স্বর্গে যেতে পারবেন?

এর জবাব হচ্ছে, হ্যাঁ, অবশ্যই তাদেরও জান্নাতে যাওয়ার পথ খোলা আছে। এক্ষেত্রে শর্ত হোল, তাদেরকে শেষ নবী ও শেষ গ্রন্থ কোর'আনকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। এটি শাশ্বত সত্য যে, বিশ্বাসী হিসাবে পরিগণ্য হতে হলে ধর্মের কয়েকটি মূল বিষয়ের উপর বিশ্বাস থাকতেই হবে। সেগুলি হচ্ছে: আল্লাহর উপর, মালায়েকদের উপর, সকল ঐশীগ্রন্থের উপর, সকল নবী-রসুলগণের উপর, কেয়ামত দিবসের উপর, ভাগ্যের ভালো-মন্দের নিয়ন্ত্রক আল্লাহ এ কথার উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর। তাই শেষ নবী এবং শেষ কেতাবের উপর অবিশ্বাস রেখে জান্নাতে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই তেমনিভাবে শেষ নবী মোহাম্মদ (দ.) এর অনুসারীরাও পূর্ববর্তী কোন নবী-রসুল-অবতার এবং তাঁদের আনীত কেতাবের প্রতিও অবিশ্বাস রেখে জান্নাতে যাওয়ার আশা করে লাভ নেই। এটাই রসুলাল্লাহ সুস্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন, 'আমার আহ্বান যার কানে পৌঁছালো সে যদি আমার উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে তবে সে অবশ্যই জাহান্নামী।'-হাদীস

খ্রিস্টানের জানাযা পড়ালেন রসুলাল্লাহ:

উদাহরণ হিসাবে আমরা আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান বাদশাহ নাজ্জাশিকে গ্রহণ করতে পারি। তিনি রসুলাল্লাহকে সত্য নবী এবং কোর'আনকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার করে নিলেও কার্যত এসলাম কবুল করেন নি, তবে সত্য প্রচারে অনেক সহযোগিতা করেছিলেন। নাজ্জাশী এন্তেকাল করেছিলেন তাবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীতে। আল্লাহর রসুল নাজ্জাশীর এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গেই সাহাবাদেরকে বলেন- 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা পড় যিনি তোমাদের দেশ ব্যতীত অন্য দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন।' রসুলাল্লাহ যখন জানাযায় দাঁড়ালেন তখন কয়েকজন মোনাফেক মন্তব্য করে যে, রসুলাল্লাহ একজন কাফেরের জানাযা পড়াচ্ছেন। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ জানালেন- 'গ্রন্থধারীদের কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর, আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ যথাশীঘ্র হিসাব চুকিয়ে দেন।' (আল এমরান ১৯৯)। সুতরাং নাজ্জাশী মুসলিম না হয়েও শেষ নবীকে আত্মা থেকে বিশ্বাস করে তাঁকে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাহায্য করার জন্য জান্নাতবাসী হয়েছেন। সুতরাং একই কথা হিন্দু-বৌদ্ধ-ইহুদিসহ সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। অথচ আজ সকল ধর্মের অনুসারীরাই স্রষ্টার বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে জাতীয় জীবনে মানুষের নিজেদের মনগড়া বিধান তথা পাশ্চাত্য বস্তুবাদী 'সভ্যতা' [Judeo-Christian Materialistic Civilization] দাজ্জালের হুকুম মেনে নিয়েছে।

শেষ কথা:

সুতরাং শেষ নবী কোন ধর্মকেই বাতিল করেন নি, তিনি সকল ধর্মকে সংরক্ষণ ও সত্যায়ন করেছেন। আমরা যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর অনুসারীরা পূর্ববর্তী সকল নবী ও অবতারগণের জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়কে একটি সাধারণ সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান করছি মাত্র। সেই সত্য হচ্ছে, সকল মানুষের স্রষ্টা এক, সকল মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান, সকল ধর্ম এসেছে একই স্রষ্টার কাছ থেকে, সকল নবী-রসুল-অবতারগণ একই ধর্মের অনুসারী ছিলেন, তারা একে অপরকে ভাই বলে জেনেছেন। সুতরাং আমরা যদি তাঁদের প্রকৃত অনুসারী হই তবে আমাদেরও একে অপরকে ভাই বলে বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের সবাইকেই অন্য ধর্মের নবী-রসুলকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। এতটুকু উদারতা বা হৃদয়ের প্রসারতা যদি আমরা প্রদর্শন করতে না পারি তাহলে পার্থিব ও পারলৌকিক কোন জগতেই আমরা শান্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবো না। এই ঐক্য আল্লাহর চূড়ান্ত অভিপ্রায়। তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, তার মধ্যে ভালো-মন্দ জ্ঞান দান করেছেন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে তারও কিঞ্চিৎ জ্ঞান তিনি মানুষকে দিয়েছেন। সুতরাং মানুষ এটা বুঝতে সক্ষম যে, ঐক্যই হচ্ছে শান্তির পথ। মহান আল্লাহ চান মানুষ যেন নিজের বিবেক থেকে সকলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা অর্জন করে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন। এরূপ তিনি করেন নি, যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। (সুরা মায়েদা ৪৮)। এখন আমরা মানবজাতি সত্যের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবো, নাকি বর্তমানের মতই বিভেদ বিভাজন সৃষ্টি করে হানাহানি, মারামারি, কোন্দলের মধ্যেই লিপ্ত থাকবো? মানুষ হিসাবে সেটাই এখন আমাদের পরীক্ষা।

[লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক দেশেরপত্র, ই-মেইল: mdriazulhsn@gmail.com
০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫,
০১৭৮২১৮৮২৩৭, ০১৫৫৯৩৫৮৬৪৭]

এক নজরে হেযবুত তওহীদ

প্রতিষ্ঠাতা:
মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ পবিত্র শবে বরাতে টাঙ্গাইলের করটিয়ার বিখ্যাত পন্নী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী তারিখে তিনি প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দা গ্রহণ করেন।

প্রতিষ্ঠা: ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ ঈসায়ী; করটিয়া, টাঙ্গাইল।

ধরন: সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন যার মূল কাজই হলো মানবজাতিকে ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা এবং মানবজাতির অশান্তির মূল কারণ দাজ্জালকে প্রতিহত করে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

কাঠামো: এমাম-আমীর-সদস্য
(সদস্যদেরকে মোজাহেদ-মোজাহেদা বলা হয়ে থাকে)

বর্তমান আনুগত্যের ধারাবাহিকতা:
হেযবুত তওহীদ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ স্বয়ং, তিনিই একে গত ১৯ বছর ধরে পরিচালনা করে আসছেন। এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ মানবজাতির মধ্য থেকে মাননীয় এমামুয্যামানকে এ যুগের নেতা হিসাবে মনোনীত করেছেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর থেকে আন্দোলনের এমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন তাঁরই আদর্শের উত্তরাধিকার জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।

উদ্দেশ্য:
সমগ্র মানবজাতিকে স্রষ্টার হুকুমের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য:

- মানবজাতির বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ স্রষ্টার বিধান। মোসলেম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যাটিসহ সমস্ত মানবজাতি আজ তার সমষ্টিগত জীবন মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা দিয়ে পরিচালনা করছে। ফলে সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই, মানুষের জীবন সংঘর্ষ, রক্তপাত, অন্যায়, অবিচারে পূর্ণ হয়ে আছে। মানুষের তৈরি এই বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র এ সমস্যাগুলোর সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে। হেযবুত তওহীদের বক্তব্য এই যে, শান্তি, ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ বর্তমান জীবনব্যবস্থা (System) বাদ দিয়ে স্রষ্টার, আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তা সমষ্টিগত জীবনে কার্যকরী করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।
- বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এসলাম ধর্ম নামে যে ধর্মটি চালু আছে সেটা আল্লাহর প্রকৃত এসলাম নয়। গত ১৪০০ বছর ধরে ধীরে ধীরে আল্লাহর প্রকৃত এসলাম ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। আল্লাহ অতি দয়া করে তাঁর প্রকৃত এসলাম যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়েছেন। হেযবুত তওহীদ সেই প্রকৃত এসলামের দিকে আহ্বান কোরছে।
- সমগ্র মানবজাতি এক স্রষ্টার সৃষ্টি এবং একই বাবা-মা আদম হাওয়ার সন্তান। কাজেই সবাই ভাই-বোন। এই ধারণার ভিত্তিতে পুরো মানবজাতি যদি স্রষ্টার বিধানের উপর ঐক্যবদ্ধ হয় তবে এই পৃথিবীর যাবতীয় অশান্তি দূর হবে।
- ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে। ধর্মের কোন বিনিময় চলে না। বিনিময় নিয়ে ধর্ম বিকৃত হয়ে যায়। কাজেই ধর্মের কাজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে করতে হবে এবং বিনিময় নিতে হবে কেবল আল্লাহর কাছ থেকে।
- সহজ সরল সেরাতুল মোস্তাকীম দীনুল হক, এসলামকে পণ্ডিত, আলেম, ফকীহ, মোফাস্সেরগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বহু মতের সৃষ্টি করেছে। ফলে একদা অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী হাজারো ফেরকা, মাজহাব, দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে আছে। ভারসাম্যহীন সুফিরা জাতির সংগ্রামী চরিত্রকে উল্টিয়ে ঘরমুখী, অন্তর্মুখী করে নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে। ফলে একদা অর্দ্ধ-বিশ্বজয়ী দুর্বার গতিশীল যোদ্ধা জাতিটি আজ হাজার হাজার আধ্যাত্মিক তরিকায় বিভক্ত, স্থবির উপাসনাকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এই উভয় শ্রেণির কাজের ফলে এসলামের উদ্দেশ্যই পাল্টে গেছে। সংগ্রাম করে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে ধর্মের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আত্মার উন্নয়ন এবং জীবনের ব্যক্তিগত অঙ্গনের ছোট খাটো বিষয়ের মাসলা মাসায়েল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা।
- ব্রিটিশরা এই জাতিকে পদানত করার পর এরা যেন কোনদিন আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে এজন্য একটি শয়তানি ফন্দি আঁটে। তারা এ জাতির মানুষের মন ও মগজকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য দু'টি সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করে, যথা: মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। তাদের অধিকৃত সকল উপনিবেশেই তারা মুসলমানদেরকে এসলাম শিক্ষা দেওয়ার নাম করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে তারা নিজেদের মনগড়া একটি বিকৃত-বিপরীতমুখী এসলাম শিক্ষা দেয়। মাদ্রাসাগুলির অধ্যক্ষপদ তারা নিজেদের হাতে রেখে দীর্ঘ ১৪৬ বছর এই উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে তাদের তৈরি 'এসলাম' শিক্ষা দিয়েছে। এখানে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোন কিছুই রাখা হলো না, যেন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার করে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রী করে রোজগার করা ছাড়া আর কোন পথ না থাকে। খ্রিস্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে করল যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রী করে উপার্জন করতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত এসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; এ উপমহাদেশসহ খ্রিস্টানরা তাদের অধিকৃত সমস্ত মোসলেম দেশগুলিতে এই একই নীতি কার্যকরী করেছে এবং সর্বত্র তারা একশ' ভাগ সফল হয়েছে।
- ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাটি তারা চালু করল স্কুল কলেজের মাধ্যমে। এ ভাগটা তারা করল এই জন্য যে, এ বিরাট এলাকা শাসন করতে যে জনশক্তি প্রয়োজন তা এদেশের মানুষ ছাড়া সম্ভব ছিল না; সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কেরাণীর কাজে অংশ নিতে যে শিক্ষা প্রয়োজন তা দেওয়ার জন্য তারা এতে ইংরেজি

ভাষা, সুদভিত্তিক অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, ইতিহাস (প্রধানতঃ ইংল্যান্ড ও ইউরোপের রাজা-রাণীদের ইতিহাস), ভূগোল, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখলো; সেখানে আল্লাহ, রাসুল, আখেরাত ও দীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হোলো না, সেই সঙ্গে নৈতিকতা, মানবতা, আদর্শ, দেশপ্রেম ইত্যাদি শিক্ষাও সম্পূর্ণ বাদ রাখা হলো। তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হোলো যাতে তাদের মন শাসকদের প্রতি হীনমন্যতায় আপ্লুত থাকে এবং পাশাপাশি তাদের মন-মগজে, আল্লাহ, রসুল, দীন সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষ (A hostile attitude) সৃষ্টি হয়। বিশ্ব-রাজনৈতিক কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের খ্রিস্টান শক্তিগুলি তাদের উপনিবেশগুলিকে বাহ্যিক স্বাধীনতা দিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় তারা ক্ষমতা দিয়ে যায় এই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিটির উপর যারা চরিত্রে ও আত্মায় ব্রিটিশদের দাস। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া সেই শিক্ষাব্যবস্থা আজও চালু আছে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী নামে খ্রিস্টান হলেও তারা প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আ:) এর অনুসারী ছিলো না। ঈসা (আ:) এর শিক্ষাকে বহু পূর্বেই তারা বাদ দিয়ে ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

- **আল্লাহর শেষ রসুল আখেরি যামানায় যে এক চক্ষুবিশিষ্ট দানব দাজ্জালের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যাকে ঈসা (আ:) এন্টি ক্রাইস্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন, মাননীয় এমামুয্যামান সেই দাজ্জালকে হাদিস, বাইবেল, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী সভ্যতাই হচ্ছে সেই দাজ্জাল। বর্তমানে সমগ্র মানবজাতি সেই দাজ্জালের তৈরি জীবনবিধান মেনে নিয়ে তার পায়ে সেজদায় পড়ে আছে। পরিণামে তারা একদিকে যান্ত্রিক প্রগতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করলেও মানুষ হিসাবে তারা পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে। সমগ্র মানবজাতি ঘোর অশান্তি, অন্যায়, অবিচারের মধ্যে ডুবে আছে। দাজ্জালের হাত থেকে পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই সংগ্রাম করে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ। আল্লাহর রসুল বলেছেন যে, যারা দাজ্জালকে প্রতিরোধ করবে তারা বদর ও ওহুদ দুই যুদ্ধের শহীদের সমান মর্যাদার অধিকারী হবে (আবু হোরায়রা রা. থেকে বোখারী মোসলেম)। হেযবুত তওহীদের যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তাদেরকেও আল্লাহ দুই শহীদ হিসাবে কবুল করে নিয়েছেন। যার প্রমাণস্বরূপ তিনি একটি বিরাট মো'জেজা হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। তা হোলো: এই দাজ্জাল প্রতিরোধকারীরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের দেহ শক্ত (রাইগরমর্টিস) ও শীতল হয়ে যায় না। জীবিত মানুষের ন্যায় নরম ও স্বাভাবিক থাকে।**

মূলনীতি:

- হেযবুত তওহীদ চেষ্টা করবে আল্লাহর রসুলের প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করতে।
- হেযবুত তওহীদের কোন গোপন কার্যক্রম থাকবে না, সবকিছু হবে প্রকাশ্য এবং দিনের আলোর মত পরিষ্কার।
- হেযবুত তওহীদের কেউ কোন আইনভঙ্গ করবে না, অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না, গেলে তাকে এমাম নিজেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দেবেন।
- যারা হেযবুত তওহীদের সদস্য নয়, তাদের থেকে কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করা হবে না।
- হেযবুত তওহীদের কোন সদস্য কোন প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে না।
- কর্মক্ষম কেউ বেকার থাকতে পারবে না, বৈধ উপায়ে রেযেক হাসিলের চেষ্টা করবে।

কর্মসূচি:

মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ যে কর্মসূচি তাঁর শেষ রসুলকে দান করেছিলেন, যে কর্মসূচি স্বয়ং আল্লাহর রসুল এবং তাঁর হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদী অনুসরণ করেছিলেন সেই পাঁচ দফা কর্মসূচি অনুসরণ করেই হেযবুত তওহীদ সত্যদীন, দীনুল হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই ৫ দফা কর্মসূচি তিনি তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ করার সময় বোলছেন– এই কর্মসূচি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, এখন এটা তোমাদের হাতে অর্পণ করে আমি চলে যাচ্ছি। সেগুলো হোলো :

(১) ঐক্যবদ্ধ হও।
(২) (নেতার আদেশ) শোন।
(৩) (নেতার ঐ আদেশ) পালন করো।
(৪) হেযরত (অন্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগ) করো।
(৫) (এই দীনুল হক কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো। এখানে জেহাদ অর্থ: সর্বাত্মক চেষ্টা, প্রচেষ্টা।

যে ব্যক্তি এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হোল, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে এসলামের রজ্জু খুলে ফেললো- যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের দিকে আহ্বান করলো, সে নিজেকে মোসলেম বোলে বিশ্বাস করলেও, নামায পড়লেও এবং রোজা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানী পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]।

প্রশিক্ষণ:

মানবতার মুক্তির জন্য নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় চরিত্রবল, আত্মিক শক্তি, সবর, লক্ষ্যের প্রতি অবিচলতা (হানিফ)। সেই চরিত্র হতে হবে প্রধানত উপরোক্ত পাঁচ দফা ভিত্তিক অর্থাৎ তাদেরকে হতে হবে ইস্পাতের মত ঐক্যবদ্ধ, পিঁপড়ার মত সুশৃঙ্খল, স্রষ্টার প্রতি প্রকৃতির মত আনুগত্যশীল, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক, কঠোর, প্রতিবাদী, নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমী ও সংগ্রামী। এই চরিত্র অর্জনের জন্য হেযবুত তওহীদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে সঠিক পদ্ধতিতে সালাহ কায়েম করা। বর্তমানে পৃথিবীতে যে সালাহ (বা নামাজ) চালু আছে সেটা আল্লাহ এবং রসুল প্রদত্ত সঠিক নিয়ম মেনে এবং সঠিক উদ্দেশ্যে করা হয় না। হেযবুত তওহীদকে আল্লাহ সালাতের সঠিক উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া দান করেছেন। সালাতের বাইরে হেযবুত তওহীদ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন শরীরচর্চামূলক খেলাকে (যেমন কাবাডি, ফুটবল, সাঁতার) উৎসাহিত করে থাকে।

পরিচালিত প্রতিষ্ঠান:

- তওহীদ প্রকাশন
- তওহীদ কাবাডি দল

- দৈনিক দেশেরপত্র
- দৈনিক নিউজ
- দৈনিক বজ্রশক্তি
- ইলদ্রিম মিডিয়া
- বাংলাদেশের পত্র (অনলাইন পত্রিকা)
- jatiyatv.com (অনলাইন)
- ওয়েবসাইট: www.hizbuttawheed.com

প্রকাশিত পুস্তকসমূহ

- এসলামের প্রকৃত রূপরেখা
- এসলামের প্রকৃত সালাহ্
- দাজ্জাল? ইহুদী-খৃস্টান 'সভ্যতা'
- Dajjal? The Judeo-Christian Materialistic 'Civilization'! (অনুবাদ)
- হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
- আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
- বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ
- ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা
- যুগসন্ধিণে আমরা
- বাঘ-বন-বন্দুক
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলী
- বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) এর ভাষণ
- এসলাম শুধু নাম থাকবে
- যামানার এমামের পক্ষ থেকে মহাসত্যের আহ্বান
- এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব
- আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই, এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (সংক্ষিপ্ত)
- চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা
- Divide and Rule

শোষণের হাতিয়ার

- জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব
- দান: এসলামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি

প্রকাশিতব্য: The Lost Eslam

প্রামাণ্যচিত্র

- একজাতি একদেশ ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ
- ধর্মব্যবসা ও ধর্ম নিয়ে অপ-রাজনীতির ইতিবৃত্ত
- নারীর মর্যাদা
- দাজ্জাল? ইহুদী-খৃস্টান 'সভ্যতা'!
- দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার
- আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
- অন্যান্য দল না করে হেযবুত তওহীদ কেন করব?
- The Leader of the Time (গানের অ্যালবাম-সিডি)
- সকল ধর্মের মর্মকথা-সবার উর্ধ্বে মানবতা
- সন্ত্রাসবাদ

বৃহত্তম মাইলফলক:

২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে মহান আল্লাহ্ এক মহান মোজেজা সংঘটন করেন যার দ্বারা তিনি তিনটি বিষয় সত্যায়ন করেন। যথা: হেযবুত তওহীদ হক (সত্য), এর এমাম আল্লাহর মনোনীত হক এমাম, হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হবে।

কর্মপ্রক্রিয়া

হেযবুত তওহীদ রাষ্ট্রীয় আইনকে পূর্ণরূপে মান্য করে গত ১৯ বছর ধরে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। মানবজাতিকে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের দিকে আহ্বান করার জন্য হেযবুত তওহীদ মাননীয় এমামুয্যামানের বক্তব্য ও লেখা সম্বলিত হ্যান্ডবিল, বই, পত্রিকা, প্রামাণ্যচিত্র ইত্যাদি সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে। এরই অংশ হিসাবে বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে, রাস্তাঘাটে এই প্রকাশনা সামগ্রীগুলি বিক্রয়, বই মেলায় স্টল গ্রহণ, শিল্পকলা একাডেমী, পৌর মিলনায়তন, জাতীয় প্রেসক্লাব, পাবলিক লাইব্রেরির সেমিনার কক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল, জাতীয় যাদুঘরের সেমিনার কক্ষসহ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের উপস্থিতিতে, সকল ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তি ও ধর্মগুরুদের নিয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে, এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে আমাদের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবহিত করে থাকি এবং প্রকাশনাসমূহ দিয়ে আমাদের বক্তব্য সম্পর্কে জানিয়ে থাকি। হেযবুত তওহীদের প্রকাশনাগুলি আন্দোলন ও পত্রিকার ওয়েবসাইটগুলিতেও প্রকাশ করা হয়।

অর্থের উৎস

হেযবুত তওহীদের সদস্যরা নিজেদের উপার্জিত বা অর্জিত সম্পদ ব্যয় করে আন্দোলনের কাজ করে থাকেন। অবশ্য মানবজাতির কল্যাণে যে কেউ নিজেদের সম্পদ দিয়ে এই সত্য প্রচার কোরতে পারেন।

অনন্যতা

হেযবুত তওহীদ গত ১৯ বছরে দেশের একটিও আইনভঙ্গ করে নি, এর কোন সদস্য একটিও অপরাধ করে নি। এর প্রমাণ গত ১৯ বছরে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ৪৫০টির অধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে কিন্তু একটি মামলাতেও এর কোন একজন সদস্যেরও কোন আইনভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সুতরাং তাদের কেউ সাজাপ্রাপ্ত হন নি। আইন মান্য করার এরূপ দৃষ্টান্ত দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলির একটিও দেখাতে পারে নি।

সকল কাজে নারীদের অংশগ্রহণ: রসুলাল্লাহর সময় যেমন পুরুষ আসহাবদের পাশাপাশি নারী আসহাবগণও জাতীয় ও সামাজিক প্রায় সকল কাজে অংশগ্রহণ কোরেছেন ঠিক তেমনি হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রায় সকল কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করে থাকে। আমীরের দায়িত্ব থেকে শুরু করে অফিসিয়াল কাজ, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কাজ (যেমন: প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাজ, হিসাব রক্ষণ বিভাগের কাজ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি) এমনকি পত্রিকা, বই বিক্রির কাজেও নারীরা শরীয়াহ নির্ধারিত যথাযথ হেজাব অনুসরণ কোরে পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

হেযবুত তওহীদ সুস্থ ধারার সংস্কৃতিকে লালন করে। এমামুয্যামানের স্মরণে হেযবুত তওহীদের প্রকাশিত প্রথম গানের অ্যালবাম "দ্য লিডার অব দ্য টাইম'। সেমিনারগুলিতে হেযবুত তওহীদের সদস্য-সদস্যরা যন্ত্রানুসঙ্গ সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করে।

সাধারণত দুইটি শ্রেণি আমাদের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচারে লিপ্ত। (ক) ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা শ্রেণি (খ) দাজ্জালের অনুগত এসলাম বিদ্বেষী একশ্রেণির মিডিয়া। তাদের সম্মিলিত অপপ্রচার, প্রপাগাণ্ডা ইত্যাদির সত্ত্বেও নিরলসভাবে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এমামুয্যামানের অনুসারীগণ।

[যোগাযোগ: হেযবুত তওহীদ, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৭৮২১৮৮২৩৭, ০১৫৫৯৩৫৮৬৪৭

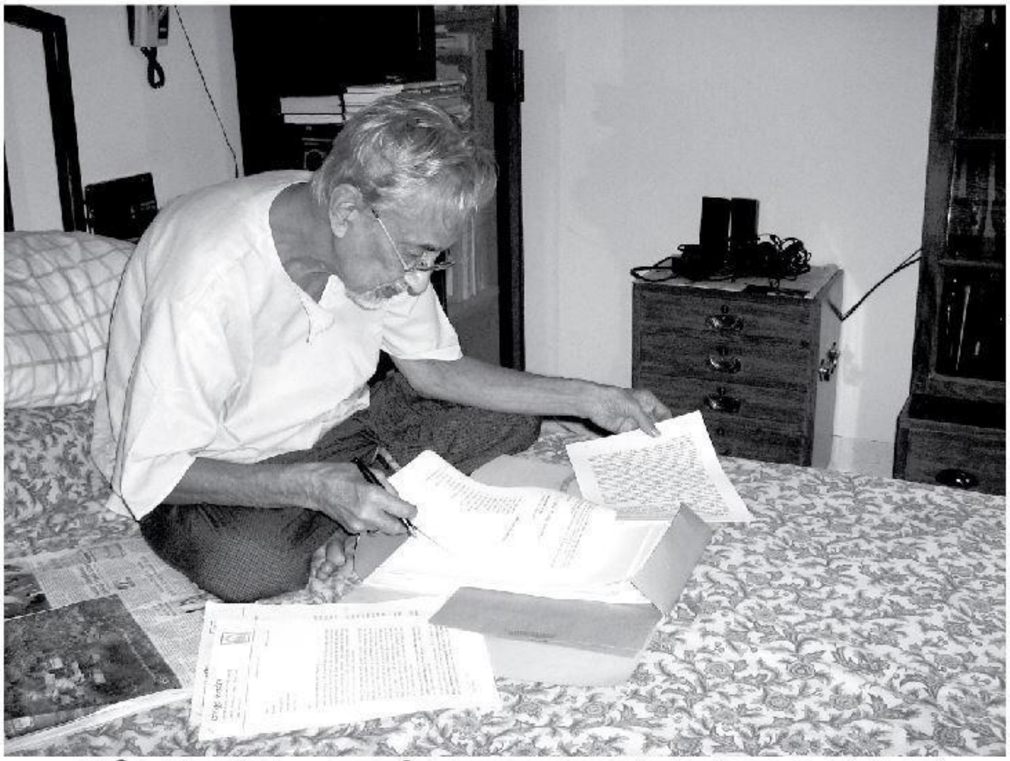

মাননীয় এমামুয্‌যামান ২০০৮ সনে জঙ্গিবাদ দমনে সরকারকে সহায়তা করার জন্য যে প্রস্তাবনা প্রেরণ করেছিলেন সেটা চূড়ান্তরূপে পরীক্ষা করছেন।

মাননীয় এমামুয্‌যামান
মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মাননীয় এমামুয্‌যামান ছিলেন ঐতিহ্যবাহী পন্নী জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর পরিবারের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। সুলতানী যুগে এবং মুঘল আমলে এ পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন অত্র এলাকার শাসক। এমন কি তারা দীর্ঘকাল বৃহত্তর বাংলার (তদানীন্তন গৌড়) স্বাধীন সুলতান ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে এই পরিবারের কীর্তি এক সূত্রে গাঁথা। বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন এমামুয্‌যামানেরই পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নী (কররানি)। এ ব্যাপারে একটি ভুল ইতিহাস চালু আছে, বলা হোয়ে থাকে বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা, কিন্তু এটি একটি ঐতিহাসিক ভুল। হায়দার আলী চৌধুরী তার 'পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ' গ্রন্থে উল্লেখ কোরেছেন যে, "স্বাধীন নবাব বোলে যে কথাটি প্রচলিত তা ঐতিহাসিক সত্য নয়! স্বাধীন নবাব কথাটি নাট্যকারদের লেখা। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। নবাব কোনদিন স্বাধীন হয় না (পৃষ্ঠা: ৭৭)"। তাঁর এই কথা অত্যন্ত যৌক্তিক, কারণ নবাব শব্দটি আরবি নায়েবের অন্যতম রূপ। আর নায়েব মানেই শাসকের প্রতিনিধি। সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন মুঘল শাসকদের নিয়োজিত সুবেদার। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে বাংলার শাসনে সর্বশেষ স্বাধীন শাসনকর্তা সিরাজ-উদ-দৌলা নন। সিরাজ-উদ-দৌলা তার পূর্বসূরী নবাব আলীবর্দী খানসহ সবাই ছিলেন তৎকালীন দিল্লির মসনদে আসীন মুঘল সম্রাটদের অনুগত প্রতিনিধি। প্রকৃতপক্ষে বাংলার স্বাধীন শাসক এবং স্বাধীনতা গত হয় আরো অনেক আগে। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে সত্যিকার ইতিহাস জানতে ফিরে যেতে হবে আরো পেছনে।

মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নীর পরাজয় এবং হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই মূলত: বাংলার শাসন ক্ষমতা থেকে 'স্বাধীন' শাসকের অবসান ঘটে। সুতরাং ১৭৫৭ সালের ২৩ ই জুন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নন, ১৫৭৬ সনের ১২ জুলাই বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খান পন্নীর অবসানের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর শুধু পন্নী বংশই নয়, কোন শাসকই আর স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন কোরতে সক্ষম হন নি। পন্নী রাজবংশের পরাজয়ের পর বারো ভূঁইয়াখ্যাত পন্নীদের অনুগত দৃঢ়চেতা কমান্ডার ও জমিদারগণ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্বীকার করে আঞ্চলিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে অবশ্য তারাও মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার কোরতে বাধ্য হন। মুঘল সুবেদার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পতনের পর ধীরে ধীরে শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চোলে যায়।

আমাদের এই উপমহাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী যখন খ্রিস্টান ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত, বিশেষ করে মোসলেম বিশ্ব যখন ইহুদি-খ্রিস্টানদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ এই জাতির উপর সদয় হোলেন, তিনি পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর মনোনীত একজন মহামানব, এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে। মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ

বায়াজীদ খান পন্নী করটিয়া, টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন শুরু হয় রোকাইয়া উচ্চ মাদ্রাসায় যার নামকরণ হোয়েছিল করোটিয়ার সা'দাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ওয়াজেদ আলী খান পন্নী'র স্ত্রী অর্থাৎ এমামুয্যামানের দাদীর নামে। দুই বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তিনি ভর্তি হন এইচ. এম. ইনস্টিটিউশনে যার নামকরণ হোয়েছিল এমামুয্যামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী'র নামে। এই স্কুল থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন (বর্তমানে এস.এস.সি) পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে কিছুদিন অতিবাহিত করে ভর্তি হন বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে। সেখানে প্রথম বর্ষ শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন যা বর্তমানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ নামে পরিচিত। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

কলকাতায় তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কলকাতা ছিলো এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্যামান ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ দল ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দান কোরেছিল যথা- মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং মোহম্মদ আলী জিন্নাহ'র নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ। কিন্তু এমামুয্যামান এই দু'টি বড় দলের একটিতেও যুক্ত না হোয়ে যোগ দিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক আন্দোলনে। আন্দোলনটি অনন্য শৃঙ্খলা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরো ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এমামুয্যামান ছাত্র বয়সে উক্ত আন্দোলনে সাধারণ একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করেও খুব দ্রুত তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পুরাতন নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের দায়িত্বপদ লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে আন্দোলনের কর্ণধার আল্লামা মাশরেকী'র নজরে আসেন এবং স্বয়ং আল্লামা মাশরেকী তাঁকে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ কাজের *(Special Assignment)* জন্য বাছাইকৃত ৯৬ জন 'সালার-এ-খাস হিন্দ' (বিশেষ কমান্ডার, ভারত) এর একজন হিসেবে নির্বাচিত করেন। এটি ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং দেশবিভাগের ঠিক আগের ঘটনা, তখন এমামুয্যামানের বয়স ছিলো মাত্র ২২ বছর। দেশ বিভাগের অল্পদিন পর তিনি বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান) নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন।

আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান মাশরেকী 'খাকসার' আন্দোলন ভেঙ্গে দেওয়ার পর আন্দোলনের এসলামপ্রিয় নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা চান আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে। এজন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হোয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং করটিয়াতে এমামুয্যামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। কিন্তু এমামুয্যামান আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হোতে চান না। এরপর বেশ কয়েকবছর তিনি রাজনীতির সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে নিরিবিলি জীবনযাপন আরম্ভ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ছিল শিকারের শখ। তাই যখনই সময় সুযোগ পেতেন বেরিয়ে পড়তেন শিকারে। রায়ফেল হাতে হিংস্র পশুর খোঁজে ছুটে বেড়াতেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে-জঙ্গলে। শিকারের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে তিনি 'বাঘ-বন-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন।

এভাবে এক যুগেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হবার পর এলাকাবাসীর অনুরোধে তিনি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন।

মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র চাচাতো ভাই জনাব খুররম খান পন্নী ছিলেন টাঙ্গাইল-বাসাইল নির্বাচনী আসনের প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) যিনি ১৯৬৩ সনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হোলে উক্ত আসনটি শূন্য হোয়ে যায় এবং শূন্যতা পূরণের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় এমামুয্যামান এই উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের প্রার্থীগণসহ বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করে এম.পি. নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীই এত কম ভোট পান যে, সকলেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হোয়ে যায়।

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন। এছাড়াও তিনি আরও যে সংসদীয় উপকমিটিগুলির সদস্য ছিলেন তার মধ্যে স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পাবলিক-একাউন্ট, কমিটি অফ রুল অ্যান্ড প্রসিডিউর, কমিটি অন কনডাক্ট অফ মেম্বারস, সিলেক্ট কমিটি অন হুইপিং বিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি নিজ নির্বাচনী এলাকা (Constituency) পরিবর্তন করা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয়ী হোতে পারেন নি। এরপর থেকে তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক অঙ্গনের নৈতিকতা বিবর্জিত পরিবেশে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না।

বর্তমানে যারা এদেশের মানুষের ভোট নিয়ে সংসদে যাচ্ছেন বা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে যাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আমরা প্রায়ই দেখি যে, তারা ভোটের সময় মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ মিনতি করে ভোটভিক্ষা করেন কিন্তু জয়লাভ করার পর নিজেদের যাবতীয় ওয়াদা বেমালুম ভুলে যান। এজন্য পরবর্তী নির্বাচনের আগে তাদের আর দেখা পাওয়া যায় না। তারা এলাকার উন্নয়ন কাজ অথবা আইন প্রণয়ন কোনভাবেই জনগণের সেবা করেন না, নিজেদের স্বার্থ হাসিল কোরতেই তৎপর থাকেন। এ কারণে পরবর্তী নির্বাচনের সময় ভোট চাইতে গেলে জনগণও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এমন কি অনেক সময় অপমানিত হন। অথচ মাননীয় এমামুয্যামান যখন রাজনীতিতে ছিলেন তখন এই অঙ্গন আজকের মতো এতটা মিথ্যাচারে পূর্ণ ছিল না। তারমধ্যেও মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব, সততা, নিষ্ঠা, ওয়াদাপূরণ, নিঃস্বার্থ জনকল্যাণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কারণে আইন পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হোয়েও তিনি অনেক প্রবীণ ও জ্যেষ্ঠ রাজনীতিকবৃন্দের সমীহ ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হোচ্ছেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের আদমজীসহ বিভিন্ন এলাকায় মোসলেম ও হিন্দুদের মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভিন্ন স্থানে বাঙালি ও বিহারীদের মাঝে সংঘর্ষের ঘটনা শুরু হয়। দাঙ্গায় প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘোটেছিল এবং অবাধে চোলেছিল লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ। দাঙ্গায় গৃহহীন হোয়ে পড়ে শত শত মানুষ। মানুষের সরকারবিরোধী মনোভাব অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য এসময় আইয়ুব সরকার এই দাঙ্গাকে আরও উৎসাহিত করে। কিন্তু মাননীয় এমামুয্যামান একজন এম.পি. হোয়েও সরকারের নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে মানবতার কল্যাণে ঢাকার দাঙ্গা কবলিত

এলাকাগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার পাশপাশি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করেন।

১৯৬৯ সনে ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি এদেশে বসবাসরত বোম্বের কাচ্ এলাকার অধিবাসী মেমোন সম্প্রদায়ের মেয়ে মরিয়ম সাত্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৬ সনে স্ত্রীর এন্তেকালের পর ১৯৯৯ সনে মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুরের খাদিজা খাতুনের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন।

এমামুয্যামান ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে রাগসঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন। এই একই ওস্তাদের কাছে গান শিখেছিলেন জাতীয় কবি নজরুলও। মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন নজরুল একাডেমি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা এবং এর ট্রাস্টি বোর্ডের আজীবন সদস্য।

প্রকৃত এসলামের জ্ঞান লাভ

ভেদাভেদ আর হানাহানিতে লিপ্ত অন্য জাতিগুলি দ্বারা শোষিত ও লাঞ্ছিত মোসলেম জাতি সম্পর্কে এমামুয্যামান ভাবতেন ছোট বয়স থেকেই। ছোটবেলায় যখন তিনি মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি তাঁকে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়, তিনি এগুলির জবাব জানার জন্য ব্যাকুল হোয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশবকালে প্রায় সমগ্র মোসলেম বিশ্ব ইউরোপীয় জাতিগুলির দ্বারা সামরিকভাবে পরাজিত হোয়ে তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে জীবনযাপন কোরছিল। মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে, এরাই কি সেই জাতি যারা সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী? কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দুনিয়ার সবচেয়ে হত-দরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত?

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে অনুধাবন কোরলেন কি সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা যারা পুরুষানুক্রমে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মগ্ন ছিলো, যারা ছিল বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত জাতি, তারাই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত হোলো যে তারা তখনকার দুনিয়ার দু'টি মহাশক্তিকে *(Super power)* সামরিক সংঘর্ষে পরাজিত করে ফেলল, তাও আলাদা আলাদাভাবে নয় - একই সঙ্গে দু'টিকে, এবং অর্ধ পৃথিবীতে একটি নতুন সভ্যতা অর্থাৎ দীন (যাকে বর্তমানে বিকৃত আকীদায় ধর্ম বলা হয়) প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই পরশপাথর হোচ্ছে প্রকৃত এসলাম যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রসুল সমগ্র মানবজাতির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। এমামুয্যামান আরও বুঝতে সক্ষম হোলেন আল্লাহর রসুলের ওফাতের ৬০/৭০ বছর পর থেকে এই দীন বিকৃত হোতে হোতে ১৩'শ বছর পর এই বিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঐ সত্যিকার এসলামের সাথে বর্তমানে এসলাম হিসাবে যে ধর্মটি সর্বত্র পালিত হোচ্ছে তার কোনই মিল নেই, ঐ জাতিটির সাথেও এই জাতির কোন মিল নেই। শুধু তাই নয়, বর্তমানে প্রচলিত এসলাম সীমাহীন বিকৃতির ফলে এখন রসুলাল্লাহর আনীত এসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয়ে পরিণত হোয়েছে। যা কিছু মিল আছে তার সবই বাহ্যিক, ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানের মিল, ভেতরে, আত্মায়, চরিত্রে এই দু'টি এসলামের মধ্যে কোনই মিল নেই, এমনকি দীনের ভিত্তি অর্থাৎ তওহীদ বা কলেমার অর্থ পর্যন্ত পাল্টে গেছে, কলেমা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বই হারিয়ে গেছে, দীনের আকীদা অর্থাৎ এই দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণাও বদলে গেছে।

এই জাতির পতনের কারণ যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হোয়ে গেল, তখন তিনি কয়েকটি বই লিখে এই মহাসত্য মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পান। ১৯৯৫ সনে এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং মানুষকে প্রকৃত এসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ছাড়া জগতের সকল বিধানদাতা, হুকুমদাতা, সার্বভৌম অস্তিত্বকে অস্বীকার করাই হোচ্ছে তওহীদ, এটাই এই দীনের ভিত্তি। সংক্ষেপে এর মর্মার্থ হোচ্ছে আমি জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যেখানেই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য আছে সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি যে বিভাগেই হোক না কেন, সেই ব্যাপারে আমি আর কারও কোন বক্তব্য, নির্দেশ মানি না। বর্তমান দুনিয়ার কোথাও এই তওহীদ নেই, সর্বত্র আল্লাহকে কেবল উপাস্য বা মা'বুদ হিসাবে মানা হোচ্ছে, কিন্তু এলাহ বা সার্বভৌমত্বের আসনে আল্লাহ নেই। মানুষ নিজেই এখন নিজের জীবনব্যবস্থা তৈরি করে সেই মোতাবেক জীবন চালাচ্ছে। তওহীদে না থাকার কারণে এই মোসলেম নামক জনসংখ্যাসহ সমগ্র মানবজাতি কার্যত মোশরেক ও কাফের হোয়ে আছে। মাননীয় এমামুয্যামান ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতিকে এই শেরক ও কুফর থেকে মুক্ত হোয়ে পুনরায় সেই কলেমায় ফিরে আসার ডাক দিয়েছেন। তিনি আরও বোলেছেন, আমাদের দেশসহ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি চোলছে তার নেপথ্য কারণ হোলো আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা বাদ দিয়ে মানবরচিত তন্ত্র-মন্ত্র গ্রহণ করা। এই তন্ত্র-মন্ত্র গ্রহণ করে আমরা শতধাবিচ্ছিন্ন, পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত দুর্বল জনসংখ্যায় পরিণত হোয়েছি। এখন আমরা যদি এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে চাই তবে সকল বাদ-বিসম্বাদ ভুলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হোতেই হবে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করার জন্যই যামানার এমামের আবির্ভাব। তিনি ভারতবর্ষে আগত আল্লাহর সকল অবতারদেরকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি সালাম পেশ কোরেছেন। এজন্য তাঁকে বিকৃত এসলামের আলেমদের বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হোতে হোয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হোয়েছে, তাঁর বাড়িতে আক্রমণ করা হোয়েছে, তাঁর বই পোড়ানো হোয়েছে। কিন্তু তিনি সত্য থেকে এক চুলও নড়েন নি।

তিনি ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সত্য সন্ধান এবং সত্যের জন্য লড়াই করে গেছেন। তাঁর ৮৬ বছরের জীবনে একবারের জন্যও আইনভঙ্গের কোন রেকর্ড নেই, নৈতিক স্খলনের কোন নজির নেই। আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলীয়ান এ মহামানব সারাজীবনে একটিও মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন।

বিশেষ অর্জন (Achievements)

১. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন: তিনি তেহরীক এ খাকসারের পূর্ববাংলা কমান্ডার ছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য 'সালার এ খাস হিন্দ' পদবীযুক্ত বিশেষ কমান্ডার নির্বাচিত হন।

২. চিকিৎসা: তিনি ছিলেন একজ প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন

বিশেষ অর্জন (Achievements)

১. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন: তিনি তেহরীক এ খাকসারের পূর্ববাংলা কমান্ডার ছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য 'সালার এ খাস হিন্দ' পদবীযুক্ত বিশেষ কমান্ডার নির্বাচিত হন।

২. চিকিৎসা: তিনি ছিলেন একজ প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল এসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৩. সাহিত্যকর্ম: বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-বন-বন্দুক বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

৪. শিকার: বহু হিংস্র প্রাণী শিকার কোরেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

৫. রায়ফেল শুটিং: ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

৬. রাজনীতি: পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন (১৯৬৩-৬৫)।

৭. সমাজসেবা: হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

৮. শিল্প সংস্কৃতি: নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য।

মাননীয় এমামুয্যামানের পরিবারভুক্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কৃতি সন্তান

⇨ নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ: তিনি ছিলেন মাননীয় এমামুয্যামানের দাদা মোহাম্মদ হায়দার আলী খান পন্নীর ছোট বোন মোসাম্মাৎ রওশন আরার স্বামী।

⇨ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী: শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ছিলেন মাননীয় এমামুয্যামানের মায়ের নানা।

⇨ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চাঁনমিয়া সাহেব: তিনি ছিলেন মাননীয় এমামুয্যামানের দাদা মোহাম্মদ হায়দার আলী খান পন্নীর বড় ভাই অর্থাৎ দাদা। এ উপমহাদেশে তিনি মুসলিম রেনেসাঁর নায়ক হিসেবে খ্যাত। তিনি তার জীবন ও সম্পদ পুরোটাই জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কল্যাণে ব্যয় করেন এবং উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দয়ালু, দানশীল, ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠক ও সমাজসংস্কারক জমিদার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। চাঁন মিয়া টাঙ্গাইলের করটিয়ায় ৩টি বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। এদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী সা'দাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অন্যতম।

⇨ মোহাম্মদ আলী বোগরা: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৩-১৯৫৫), পরবর্তীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন মাননীয় এমামুয্যামানের খালু।

⇨ বেগম সুফিয়া কামাল: বাংলা সাহিত্যের প্রধান মহিলা কবি। তিনি ছিলেন মাননীয় এমামুয্যামানের দাদীর ভাইয়ের স্ত্রী।

⇨ সৈয়দ মোহাম্মদ হোসাইন: এমামুয্যামানের নানা। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের পুলিশ বিভাগের প্রধান (আই.জি.পি)।

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫

এম.পি নির্বাচিত হওয়ার পর মাননীয় এমামুয্যামান (বাম থেকে ২য়, ফুলের মালা হাতে)

গড়ি দক্ষ ও সৎ সাংবাদিক

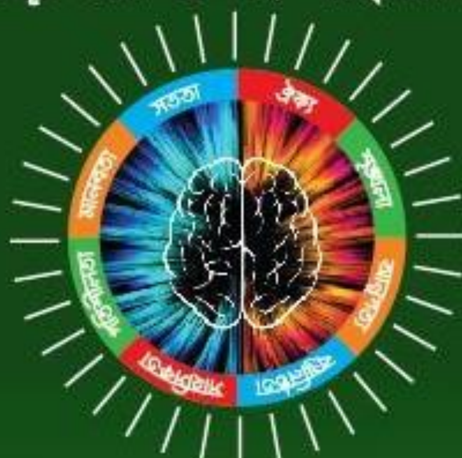

জেটিভি'র উদ্যোগে
পেশাদার সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ কর্মশালা

প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ:

০১ বেতার এবং টেলিভিশন সং[illegible] উপস্থাপনা

০২ পেশাদার টেলিভিশন সাংবা[illegible]

- বেতার এবং টেলিভিশন সংবাদ রি[illegible]টিং
- প্রমিত বাঙলা উচ্চারণ
- ক্যামেরা পরিচালনা ও আলোকসজ্জা
- ভিডিও এডিটিং

০৩ টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ কৌশল

০৪ পেশাদার সাংবাদিকতা (প্রিন্ট মিডিয়া)

- সংবাদ রচনাশৈলী
- প্রমিত বাঙলা বানানরীতি

জেটিভি লিমিটেড
৬৯৮, উত্তর শাহজাহানপুর, মতিঝিল, ঢাকা।
যোগাযোগ: ০১৯১২৪৮৩৮৩০০, ০১৬৭০১৭৪৬৬২
E-mail: jtvonline01@gmail.com

...ঐক্যের পথে মোরা
jatiyatv.com